

# কোরআন ও হাদীসের আলোকে মাহে রমজান

সংকলন ও সম্পাদনায়: মোঃ সাব্বির আলম

প্রকাশনায়: ইমামিয়াহ্ কালচারাল সেন্টার

কোরআন ও হাদীসের আলোকে মাহে রমজান

সংকলন ও সম্পাদনায়: মোঃ সাব্বির আলম

প্রকাশনায়: ইমামিয়াহ্ কালচারাল সেন্টার

প্রথম প্রকাশকাল:

২০০৫ ঈসায়ী

১৪২৬ হিজরী

দ্বিতীয় প্রকাশ

আগষ্ট ২০০৯ ঈসায়ী

রমজান ১৪৩০ হিজরী

ভাদ্র ১৪১৬ বাংলা

প্রচ্ছদ

মোঃ সাব্বির আলম

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

### রমজান প্রসঙ্গে আলোচনা

রোযার আরেকটি নাম হচ্ছে সাওম। রমজানের রোযা আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য ফরজ করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন- “হে মুমিনগন! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে। যেমন ফরজ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর। যাতে করে তোমরা তাকওয়া ও পরহেজগারী অর্জন করতে পারো।” (সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৩)।

রহমত, মাগফেরাত আর নাজাতের বার্তা নিয়ে পবিত্র মাহে রমজান বর্ষপরিক্রমায় প্রতিবছর আমাদের মাঝে ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে অন্যান্য মাস অপেক্ষা রমজান মাসের গুরুত্ব ও মর্যাদা অসীম। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ মাসকে “শাহরুল্লাহ” তথা আল্লাহর মাস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন এবং এ মাসে রোযা পালনকারীকে স্বীয় মেহমানের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। তাই এ মহিমাম্বিত মাসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও গুরুত্বকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা প্রতিটি মুমিনের উপর একান্ত অপরিহার্য। কেননা, এরই মাঝে আল্লাহর নৈকট্য ও মানুষের পরিশুদ্ধতা অর্জনের রহস্য নিহিত। প্রকৃতপক্ষে, মাহে রমজান হচ্ছে, মুমিনদের জন্য আত্মশুদ্ধি, আত্মসংযম এবং তাকওয়াপূর্ণ জীবনগড়ার সর্বোত্তম প্রশিক্ষণকাল।

এখন আমরা মাহে রমজানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ যে বিস্ময়কর আত্মশুদ্ধি ও আত্মগঠনের সূবর্ণ সুযোগ লাভ করে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্তকারে আলোকপাত করছিঃ সিয়াম শব্দের অভিধানিক অর্থ বিরত থাকা, পরিহার করা এবং সংযত হওয়া। সিয়ামের পরিভাষিক অর্থ হচ্ছে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত সকল ধরণের পানাহার, পাপাচার এবং ষড়রিপুর তাড়না থেকে নিজেকে বিরত সংযত রাখা। পাপাচার ও অনৈতিক কার্যাবলী মানবীয় স্বত্বকে পাপাসক্ত করে তোলা। আর রোযা মানুষকে এ সকল গর্হিত ও অনৈতিক

কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখে এবং মানব হৃদয়ে এক অলৌকিক প্রশান্তির আভা দান করে। রাসূল (সাঃ) বলেন, “রোযা অন্যায থেকে নিষ্কৃত পাওয়ার ঢালস্বরূপ। রমজান মাসে বরকতময় মুহূর্তগুলোতে আল্লাহ পাকের অফুরন্ত রহমতের ধারা অনবরত বর্ষিত হয়। বৃষ্টি বর্ষণের ফলে মৃত-শুষ্ক জমিন যেমন সবুজ শস্য, শ্যামলিমায় প্রানবন্ত হয়ে ওঠে, তেমনি মাহে রমজানের একটানা সিয়াম সাধনা দেহ ও আত্মাকে করে কলষমুক্ত আর মানবহৃদয়কে করে ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত। মাহে রমজান হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা শাশ্বত জীবন বিধান আল কোরআন নাজীলের মাস। আল কোরআনের ভাষায় “রমজান মাস, এ মাসেই কোরআন নাজীল হয়েছে, যা সমগ্র মানবজাতীর জন্য দিশারী, সত্যপথের স্পষ্ট পথনির্দেশকারী এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণকারী।” (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫)।

রোযা অথবা সাওমের আরেকটি আভিধানিক অর্থ হলো চুপ থাকা এবং সম্ভবতঃ হযরত মরিয়মের (আঃ) মাধ্যমে এই অর্থের কোরআন মজিদে উল্লেখ রয়েছে যে, “ইন্নি নাজরাতু লিররাহমানি সাওমা” অর্থাৎ, আমি চুপ থাকার মানত করেছি। সাওমের আরেক অর্থ হলো বিরত থাকা। সম্ভবত প্রথম অর্থের উপরেও সাওমের এই অর্থ বর্তাবে অর্থাৎ, কথা বলা থেকে বিরত থাকার মানত অথবা কথা বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। শরীয়ত এই আভিধানিক অর্থকে নিয়ে কিছু সিমাবদ্ধতা ও কিছু উপযোগ সংযুক্ত করে প্রচলিত অর্থ গঠন করেছে যেমন, উক্ত শব্দ ছাড়া (সাওম) ঐ শব্দগুলি যেমন সালাত, হজ্জ্ব অথবা জাকাত শব্দ প্রভৃতিও একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আশ্বিয়া (আঃ) গনের যুগেও মানুষদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে। কিন্তু ‘আল্লাহর অশেষ রহমত ও মেহেরবাণী যে, তিনি তার প্রিয় নবী (সাঃ) এর উপর পবিত্র কোরআনের ন্যায় এক মহান গ্রন্থা নাযিল করেছেন এছাড়া স্বয়ং রোযা সম্পর্কে আল্লাহর এরশাদ হচ্ছে অর্থাৎ, “রোযা আমার জন্য এবং আমিই তার পুরস্কার দান করবো।” (সূত্র: পক্ষিক ফজর, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭, রেজি নং এল- ৩৭৫)।

তাহলে “ইয়া আইয়ুহাল্লাযী না আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন্ ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন ” এ আয়াত দ্বারা প্রমানিত হয় যে, আল্লাহর তরফ থেকে যত

শরীয়াত দুনিয়ায় নাযিল হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই রোযা রাখার বিধি-ব্যবস্থা ছিল। চিন্তা করার বিষয় এই যে, রোযার মধ্যে এমন কি বস্তু নিহিত আছে, যার জন্যে আল্লাহ তাআলা সকল যুগের শরীয়াতেই এর ব্যবস্থা করেছেন। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৩)।

পবিত্র রমজান মাস হলো আল্লাহর মাস। এটা সেই মাস যে মাসে রহমত তথা জান্নাতের দরজা খুলে যায় আর দোষখের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। হযরত ইমাম রাযা (আঃ) হতে বর্ণিত যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) শাবান মাসের শেষের দিকে একটি খুৎবা বর্ণনা করেছিলেন। খুৎবায় তিনি বলেছিলেন যে, ওহে লোক সকল, তোমরা সকলে যেনে নাও যে আল্লাহর মাস রহমত, বরকত ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার সব চাইতে ভাল দিন নিয়ে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে। এই মাস আল্লাহর নিকট সব চাইতে উত্তম মাস। রমজান মাসের দিন সমস্ত বছরের দিনের চাইতে এবং রমজান মাসের রাত সমস্ত বছরের চাইতে উত্তম। এই মাসে তোমাদের শ্বাস নেওয়াও তসবিহ এর সোয়াবের সমতুল্য। এই মাসে তোমাদের নিদ্রা ও ইবাদতে গণ্য হবে। আর তোমাদের ইবাদতও দোয়া গৃহীত হবে। সুতরাং তোমরা পরিস্কার ও পবিত্র মনে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর এই যে, যেন আল্লাহ তোমাদের কে রমজান মাসে রোযা রাখার ও কোরআন শরীফ পড়ার সামর্থ্য দান করেন। লোকসকল! এ মাসে তোমাদের মধ্যে হতে যে একজন কোন মুমিন ভাই কে ইফতার করাবে আল্লাহ তাকে একজন ক্রীতদাস মুক্তি করে দেওয়ার সোয়াব দান করবেন আর তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেবেন। এই কথা শুনে কয়েকজন বলল যে, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ! রোযাদারের ইফতার করানোর সামর্থ্য আমাদের নেই। হযরত (সাঃ) বললেন যে, তোমরা দোষখের আশুণ হতে নিজেকে রক্ষা কর আর রোযাদার কে ইফতার করাও, হয় অর্ধেক খোরমার মাধ্যমে, না হয় এক ডুক পানির মাধ্যমে। তারপর নবী (সাঃ) বললেন যে, এই মাসে যে প্রচুর পরিমাণে আমার ও আমার আহলে বাইতের উপর দরুদ শরীফ পড়বে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার নেকির পাল্লা ভারি করে দিবেন। আবার এই মাসে যে কোরআন শরীফের একটি আয়াত ও পাঠ করবে তাকে অন্য মাসের কোরআন শরীফ শেষ করার সমান দান করা হবে। ওহে লোক সকল! এই মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, তাই দোয়া কর যে, এই

দরজা যেন তোমাদের জন্য বন্ধ করে না দেওয়া হয়। আর এই মাসে দোষখের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাই দোয়া কর যে, এই দরজা যেন তোমার জন্য খোলা না হয়। আবার এই মাসে শয়তান বন্দী হয়ে যায়। তাই তোমরা দোয়া কর যে, শয়তান যেন তোমাদের শাসনকর্তা রূপে পরিণত না হয়। (সূত্র: তোহফাতুল আওয়াম মাকবুল যদিদ, লেখকঃ হযরত আয়াতুল্লাহ আল-ওযমা সৈয়দ মোহসিন হাকিম তাবা তাবাই)

## রোযা প্রসঙ্গে

পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ রোযাকে ফরজ করেছেন এবং রোযার সময়সীমা উল্লেখ করে দিয়েছেন। কালাম পাকে সূরা বাকারায় পরিষ্কার লেখা আছে রাতের বেলায় রোযাকে পূর্ণ করা। অর্থাৎ সুবহা সাদেকের পর থেকে রাতের কালো অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে রোযাকে পরিপূর্ণ করা। আর এই আয়াতের দলিলসমূহ বাংলাদেশ ও সারা বিশ্বের সকল কোরআনের তরজমায় একই কথা ‘রাত পর্যন্ত’ উল্লেখ আছে। যার কিছু দলীলসমূহ নিম্নে দেওয়া হয়েছেঃ

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা হুকুম দিচ্ছেন যেঃ “আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না রাত্রির কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। ”

(সূত্র: আল কোরআন, সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭, নূর কোরআন শরীফ - সোলেমানিয়া বুক হাউস, ৭ নং বায়তুল মোকাররম)।

“আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়”। (সূত্র: পবিত্র কোরআনুল করীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর), মূলঃ তফসীর মাআরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা: ৯৪, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহঃ), অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, (সউদী আরবের মহামান্য শাসক খাদেমুল- হারামাইনিশ শরীফাইন বাদশা ফাহদ ইবনে আবদুল আজীজের নির্দেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পবিত্র কোরআনের এ তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর মুদ্রিত হলো)।

“আর রাতের বেলায় খানাপিনা কর, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নিকট রাতের কালো রেখা থেকে সকালের সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে না ওঠে। তখন এসব কাজ ছেড়ে দিয়ে রাত পর্যন্ত নিজেদের রোযা পূরা কর। (সূত্র: সহজ বাংলায় আল কোরআনের অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদুদী (র)- এর উর্দু তরজমার বাংলা অনুবাদ, অধ্যাপক গোলাম আযম, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, জানুয়ারি ২০০৮)।

“তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ ভোর বেলার রেখার পরে সাদা রেখা পরিষ্কার দেখা যাইবে। অতঃপর তোমরা রাত্রি পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর”। (সূত্র: বাংলা কোরআন শরীফ, ফুরফুরা শরীফের শাহ সূফী মাওলানা আবদুদ দাইয়্যান চিশতী কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, কথাকলি- ঢাকা গাইবান্ধা, সন: আগষ্ট ১৯৮৯)।

“আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণ রেখা হতে উষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত না হয়। অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর”। (সূত্র: নূর বাংলা উচ্চারণ অর্থ ও শানে নুয়ুলসহ কোরআন শরীফ, উচ্চারণ ও অনুবাদে: মাওলানা খান মোহাম্মদ ইউসুফ আবদুল্লাহ (এম.এম), ছারছীনা দারুস সুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসা খতীব, বায়তুস সালাত মসজিদ, সদরঘাট, ঢাকা- ১১০০; সোলেমানিয়া বুক হাউস, ৪৫, ৩৬ বাংলাবাজার ঢাকা- ১১০০, সন- ২০০১)।

“যে পর্যন্ত না আকাশের রাত্রের কালো রেখা হইতে উষার সাদা রেখা প্রকাশ পায় প্রত্যুষকালে, অতঃপর রোযা রাত্রি পর্যন্ত পূর্ণ কর”। (সূত্র: পবিত্র কোরআন শরীফ, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রহঃ)- এর উর্দুতরজমা বয়ানুল কোরআনের বঙ্গানুবাদ, বাংলা উচ্চারণ ও অনুবাদক আলহাজ্ব মাওলানা এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুনশী এম, এম (ফাষ্ট ক্লাস); ডি, এফ; বি, এ, (অনার্স); এম, এ, এম, ফিল, রিচার্স ফেলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিমিটেড, প্যারীদাস রোড ঢাকা, সন- ২০০৪)।

“অতঃপর রাত আসা পর্যন্ত রোযাগুলো সম্পূর্ণ করো”। (সূত্র: তরজমা- ই- কোরআন, কানযুল ঈমান কত্ব আ’লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ), তাফসীর (হাশিয়া) খাযাইনুল ইরফান কৃত সদরুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রহঃ), বঙ্গানুবাদ: আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান” প্রকাশনায়: গুলশান- ই- হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম, সন- ১৯৯৬)।

“অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত”। (সূত্র: তাফসীরে মা’আরেফুল- কোরআন, ১ম খণ্ড, মূল হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।



তোমরা পানাহার অব্যাহত রাখতে পারো যতোক্ষণ পর্যন্ত রাতের অন্ধকার রেখার ভেতর থেকে ভোরের শুভ্র আলোক রেখা তোমাদের জন্যে পরিস্কার প্রতিভাত না হয়, অতপর তোমরা রাতের আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করে নাও। (সূত্র: কোরআনের সহজ বাংলা অনুবাদ, হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমেদ, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন)।

এখানে মাত্র দশটি কোরআনের দলীলসমূহ দেখানো হয়েছে এবং প্রত্যেকটিতেই কিন্তু লাইল (অর্থ রাত) বলা হয়েছে। কিন্তু এই পৃথিবীতে কিছুসংখ্যক লোক ব্যতীত অধিকাংশই আল্লাহর এই আয়াতকে না মেনে নিজের ইচ্ছে মতে কেয়াস করে থাকেন এবং সন্ধ্যাকে লাইল (অর্থাৎ, রাত) বানিয়ে দেন। তাই আপনাদের কাছে কোরআনের এই আয়াতটিকে আরো স্পষ্ট ভাবে অর্থাৎ শব্দার্থ আকারে তুলে ধরছি যেন লাইল সম্পর্কে মানুষদের স্পষ্ট ধারণা হয়ে যায়। কোরআনে এই আয়াতের অর্থ হচ্ছেঃ

ওয়া কলু – এবং ভক্ষণ কর, আর খাও।

ওয়াশরাবু – এবং পান কর।

হান্তা - - যে পর্যন্ত, যতক্ষণ।

ইয়াতাবাঈয়ানা - স্পষ্ট হয়, প্রকাশ পায়।

আল খাইতু - রেখা, চিহ্ন, দাগ।

আল- আব্বইয়াত্বু - শুভ্র, সাদা।

মিনাল্ খাইতি - চিহ্ন হইতে, দাগ থেকে, রেখা হইতে।

আল আসওয়াদি - কৃষ্ণ, কাল।

মিনাল্ ফাজরি - প্রভাত হইতে, ভোর হইতে।

সুম্মা - অতঃপর, তারপর।

আতিম্মু - পুরা করিবে।

আস্ সিয়ামু - রোযা।

ইলা - দিকে, পর্য্যন্ত।

আল লাইলি - রাত্র, রজনী, রাত।

রোযা পূর্ণকরার সময় প্রসঙ্গে হাদীস শরীফেও বর্ণিত আছে যে, “বারাআ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাম্মদ (সাঃ) - এর সাহাবাদের কেউ রোযা রাখতেন, ইফতারের সময় উপস্থিত হলে কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি আর কিছু খেতেন না, পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবেই রোযা রাখতেন। এক সময়ের ঘটনা, কায়েস বিন সিরমা আনসারী (রা) রোযা রেখেছিলেন। ইফতারের সময় হলে তিনি স্ত্রীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে খাওয়ার মত কিছু আছে কি? স্ত্রী জওয়াব দিলেন, না। তবে আমি তালাশ করে দেখে আসি তোমার জন্য কিছু যোগাড় করতে পারি কিনা। কায়েস বিন সিরমা আনসারী ঐ সময় মজুরী খেটে খেতেন। (স্ত্রী খাবার তালাশে যাওয়ার পর) ঘুমে তার চোখ মুদে আসলো। তাঁর স্ত্রী ফিরে এসে এ অবস্থা দেখে বলে উঠলেন, তোমার জন্য আফসোস! পরদিন দুপুর হলে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। ঘটনা নবী (সাঃ) - এর নিকট পৌছলে কোরআনের আয়াত নাযিল হল। রমযানের রাত্রির বেলা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা (যৌনমিলন) হালাল করা হয়েছে....এ হুকুম অবহিত হয়ে সবাই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এরপর নাযিল হলো, তোমরা খাও ও পান করো যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো। (সূরা বাকারা: ১৮৭; সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, হা: ১৭৮০, পৃ: ২২৮)।

“আর তোমরা খাও ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো।” বারাআ (রা) এ সম্পর্কিত হাদীস নবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, ১৭- অনুচ্ছেদ, পৃষ্ঠা: ২৩৯, আধুনিক প্রকাশনী, সন- ১৯৯৩)।

আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই মাগরিবের সাথে রোযা খোলে কিন্তু এ সকল কোরআনের আয়াত থেকে কি কোন ভাবেই প্রমাণ করা সম্ভব যে ‘সত্বর’ বলতে সূর্যাস্তের সাথে সাথেই (মাগরিবের আযানের) সময়কেই বুঝায়? বরঞ্চ পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ এবং হাদিসসমূহের আলোকে ইহাই প্রকৃষ্টরূপে প্রমানিত হয় যে, মুসলমানদেরকে রোযা রাত্রি পর্যন্ত

পূর্ণ করতে হবে। পবিত্র কোরআনের আদেশ বা হুকুম কে পাশ কাটিয়ে যাওয়া বা জেনেও না জানার ভান করা, বা অনুসরণ না করার কোন পথই মুসলমানদের জন্য খোলা নেই।

## আসীল (সন্ধ্যা) ও লাইল (রাত) প্রসঙ্গে

কোরআনের অভিধানিক অর্থে ‘আসালুন’ শব্দের অর্থ হচ্ছে সন্ধ্যার সময়। (সূত্র: কোরআনের অভিধান, পৃষ্ঠা: ১৩ (কোরআনে ব্যবহৃত সকল শব্দার্থ সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ অভিধান) মুনির উদ্দিন আহমদ, পরিবেশকঃ প্রীতি প্রকাশন, ১৯১, বড় মগবাজার ঢাকা ১২১৭, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩)।

কোরআনের অভিধানিক অর্থে ‘লাইলুন’ ‘লাইলাতুন’ শব্দের অর্থ হচ্ছে রাত। (সূত্র: কোরআনের অভিধান, পৃষ্ঠা: ৩০১ (কোরআনে ব্যবহৃত সকল শব্দার্থ সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ অভিধান) মুনির উদ্দিন আহমদ, পরিবেশকঃ প্রীতি প্রকাশন, ১৯১, বড় মগবাজার ঢাকা ১২১৭, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩)।

রোযা ও ইফতারির সময় সম্পর্কে যাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ বা দ্বিধা- বিভক্তির সৃষ্টি না হয় তার সকল প্রমাণ, দলিল এবং ব্যাখ্যা আল কোরআনেই বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ দিবা-রাত্র এবং মধ্যবর্তী বিভিন্ন সময়ের উল্লেখ করতে ভিন্ন ভিন্ন শব্দমালার ব্যবহারের মাধ্যমে সেই সকল সময়কে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। যেমন লাইল অর্থ রাত, তা কোরআনে ১৬২ টি স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। তাছাড়া বাংলাতেও লাইল অর্থ যে রাত বুঝায় তা বহুল প্রচলিত যেমন: প্রত্যেকটি মুসলমান লাইলাতুল বারাত (ভাগ্য রজনী), লাইলাতুল ক্বা দর (মহিমাম্বিত রজনী) শব্দের সাথে পরিচিত এবং তার লাইল অর্থ কোন ভাবেই সন্ধ্যাকে বা সূর্যাস্তের সময়কে মনে করে না। তদ্রূপ আল্লাহ সকালকে বুকরা অপরাহুকে ‘নাহার’ বলেছেন। পবিত্র কোরআনে বিকালের সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা, ‘সূরা আল আসর’ রয়েছে, সন্ধ্যা সম্পর্কে আসীল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, প্রভাতকাল সম্পর্কে সূরা মুদাচ্ছিরের ৩৪ নং আয়াতে ‘সুবহ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, সূর্যাস্তের সময়কে পবিত্র কোরআনে ‘গুরবে শামস’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম আকাশে যে রক্তিম আভার সৃষ্টি হয় এবং যা প্রায় ১৮ থেকে ২৬ মিনিট বিদ্যমান থাকে সেই সময়কে সূরা ইনশিকাক এর ১৬ নং আয়াতে ‘শাফাক্ব’ উল্লেখ করা হয়েছে।

এবং শাফাকের পূর্ণ পরিসমাপ্তির ১০ পরেই যে লাইল বা রাতের শুরু হয় তাও সূরা ইনশিকাক এর ১৬ এবং ১৭ নং আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

রাত সম্পর্কে বা রাতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনরকম সন্দেহের অবকাশ না থাকে সে জন্যে পরমকরুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাতের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা তার কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করবঃ

“আর আমি রাত্রি ও দিবসকে (স্বীয় অসীম কদুরতে) করিয়া দিয়াছি দুইটি নিদর্শন, এবং রাত্রির নিদর্শনকে করিয়াছি অন্ধকার এবং দিনের নিদর্শনকে করিয়াছি আলোময়, যেন ইহাতে (দিনে) তোমরা তোমাদের রবের দেওয়া জীবিকা অন্বেষণ করতে পার।” (সূরা বণি ইসরাঈল, আয়াত: ১২)।

“আর তাদের জন্য আরেকটি নিদর্শন হল রাত, আমিই তার থেকে দিনকে বাহির করিয়া আনি, তখনই তো তারা অন্ধকারে আসিয়া যায়।” (সূত্র: আল কোরআন, সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ৩৭, সূরা নং: ৩৬)।

“ওয়া আয কুরিসমা রাব্বিকা বুকরাতারাও ওয়া আসীলান, ওয়া মিনাল লালাইলি ফাসজুদ লাহু ওয়া সাব্বিহু লাইলান ত্বাবী-লান”। আর সকালে ও সন্ধ্যায় আপন প্রভুর নাম স্বরণ কর। এবং রাত্রে কতক সময় মাগরীব ও এশায় তাহাকে সিজদাহ কর এবং দীর্ঘ রাত্রি ব্যাপিয়া তাহাঁর প্রশংসা বর্ণনা কর। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা দহর, আয়াত: ২৫- ২৬)।

“অতঃপর আমি সন্ধ্যার রক্তবর্ণের কসম করিতেছি, এবং রাত্রে ও রাত্রি যাহা সংগ্রহ করে তাহাঁর কসম”। (সূরা ইনশিকাক, আয়াত: ১৬- ১৭)।

“এবং দিনের কসম যখন ইহা তাহাঁর মহিমা প্রকাশ করে, এবং রাত্রে কসম যখন ইহা তাহাকে ঢাকিয়া লয়। (সূরা শামস, আয়াত: ৩- ৪, সূরা নং: ৯১)।

“রাতের কসম যখন উহা জগৎকে অন্ধকারে ঢাকিয়া লয়।” (সূত্র: আল কোরআন, সূরা লাইল, আয়াত: ১, সূরা নং: ৯২)।

“এবং রাত্রের কসম যখন উহা (অন্ধকারে ঢাকিয়া লয়) নিস্তন্ধ হয়। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা দোহা, আয়াত: ২, সূরা নং: ৯৩)।

“উহাই সকালে ও সন্ধ্যায় তাহাকে পড়িয়া শুনান হয়। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা ফুরকান, আয়াত: ৫, সূরা নং: ২৫)।

“তিনিই রাত্রিকে করিয়াছেন তোমাদের জন্য আবরণ স্বরূপ এবং নিদ্রাকে আরামের শান্তি করিয়াছেন এবং দিনকে করিয়াছেন পুনরায় উঠিবার সময়। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা ফুরকান, আয়াত: ৮৭, সূরা নং: ২৫)।

“এবং তিনিই রাত্রি ও দিনকে একে অন্যের অনুসরণকারী করিয়াছেন তাহাদের জন্য যাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে চায় অথবা শোকর আদায় করিতে চায়। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা ফুরকান, আয়াত: ৬২, সূরা নং: ২৫)।

“আল্লাহর নাম স্বরণ করা হইয়া থাকে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতে থাকে। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা নূর, আয়াত: ৩৬, সূরা নং: ২৪)।

“আল্লাহই রাত ও দিনকে পরিবর্তন করিতেছেন। নিশ্চই উহাতে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বুঝিবার বিষয় রহিয়াছে। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা নূর, আয়াত: ৩৬, সূরা নং: ২৪)।

“এবং উহার রাতকে ঢাকিয়া আঁধার করিয়া দিয়াছেন এবং ইহার প্রভাতকে আলোকে প্রকাশ করিয়াছেন। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা নাযিয়াত, আয়াত: ২৯, সূরা নং: ৭৯)।

“এবং তোমার প্রভুকে মনে মনে, সবিনয়ে, সকাতরে, গোপনে ও নিম্ন স্বরে প্রভাতও সন্ধ্যায় ইয়াদ কর এবং সাবধান, ইহাতে অবহেলা করিও না। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা আরাফ, আয়াত: ২০৫, সূরা নং: ৭)।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, “অন্ধকার আর আলো কি এক? তবে কি তাহারা আল্লাহর এমন শরীক করিয়াছে যাহারা আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করিয়াছে যে ১২ কারণে সৃষ্টি উহাদিগের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটাইয়াছে” (সূত্র: আল কোরআন, সূরা রাদ, আয়াত: ১৬, সূরা নং: ১৩)।

উল্লেখিত সমগ্র আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, লাইল বা রাত্র হলো এমন একটি সময় যা পরিপূর্ণরূপে বা সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন। যেখানে দিনের আলোর উপস্থিতির কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। লাইল বা রাত্র অর্থ: শাফাক, গুরুবে শামস, আসর বা আসীল নয়। আল্লাহর কোরআন সত্য ও সঠিক হলে যাহারা সন্ধ্যা বা গুরুবে শামস এর সময় ইফতার করে তা সম্পূর্ণ ভুল। অথবা কোরআনে কি ভুল সময় উল্লেখ করা আছে? (নাউযুবিল্লাহ)। যাহারা আল্লাহর দেয়া সময়ে রোযা পূর্ণ না করে ভুল হাদীস ও নিজেদের মনগড়া সময়ে রোযা পূর্ণ করছে তাহারা সঠিক? অবশ্যই এই রকম ধারণায় নাউযুবিল্লাহ বলারই কথা। কারন আমাদের মহান আল্লাহ রাব্বুলআলামিন সকলের চিন্তাধারণার উর্দে এবং তাহার সমতুল্য কেহই নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা কোরআনে যা হুকুম দিয়েছেন সেটাই আমাদেরকে মানতে হবে।

কোরআনে লাইল বলা হয়েছে, আসীল বলা হয় নাই। আর আসীল দ্বারা কোরআনে সন্ধ্যা বুঝানো হয়েছে। (সূত্র: তাফহীমুল কোরআন- গোলাম আযম, সূরা দাহর ২৫- ২৬, পারা: ২৯, সূরা নং: ৭৬, পৃষ্ঠা: ৩৩২, ১২তম ব্যাখ্যা)।

‘গুদুউয়ি ওয়াল আসাল’ এর শাব্দিক অর্থ সকাল- সন্ধ্যায়। আর মর্মার্থ, সব সময় (সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল- এভাবে সকল সময়)। ‘আসাল’ শব্দটি ‘আসীল’ এর বহুবচন। আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়কে বলে আসাল। (সূত্র: তাফসিরে মাযহারী, কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ), মাওলানা তালেব আলী অনূদিত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১০)।

“যাহারা আল্লাহর আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহাদের জন্য রইয়াছে ভয়ংকর মর্মন্তদ শাস্তি এবং তাহারা শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।” (সূত্র: আল কোরআন, সূরা সাবা, আয়াত: ৫, ৩৮)।

তাই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ আমাদেরকে রোযা রাত্রি পর্যন্ত পূর্ণ করার আদেশ বা হুকুম দিয়েছেন, শাফাক বা গুরুবে শামস, অথবা আসীল পর্যন্ত নয়, যাহা উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারাই প্রমানিত।

## ইফতারের সময়সীমা প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহপাক মানবজাতিকে বোধশক্তি দিয়ে তৈরি করেছেন। প্রথম পর্যায়ে ইয়াকিন (বিশ্বাস)। দ্বিতীয় পর্যায়ে আকল, তৃতীয় পর্যায়ে চিন্তা-ভাবনা। চতুর্থ পর্যায়ে ইলম (জ্ঞান)। এই পর্যায়গুলির ধারণা কমবেশী পরিলক্ষিত হয় সমাজে মানবের কর্মকান্ডে। এই পর্যায়গুলির সাথে যাকে ইচ্ছা করলেন খাস (বিশেষ) করে আওলিয়া, আশ্বিয়া (রাঃ), বন্ধু তৈরি করলেন এবং কাউকে মোমিন (বিশ্বাসী) তৈরি করলেন। আর আল্লাহপাক যাকে ইচ্ছা করেন নিজ রহমতের সাথে খাস করে নেন। আর এই সকল খাস (বিশিষ্ট) ব্যক্তিই তাঁর রহমতের (করণা) মধ্যে দাখিল (ভর্তি) আছেন। এমনকি খাস এবং আম (বিশেষ এবং সাধারণ) প্রত্যেক বস্তু তার রহমত ও ইলম এর মধ্যে আচ্ছাদিত রয়েছে। পাক কালাম মজিদে সর্বপ্রথম লেখা আছে, “হে আল্লাহ ইবলিসের প্রলোভন থেকে আমাকে রক্ষা করুন।” (সূরা মুমিনুন, আয়াত: ৯৭-৯৮)। এই মূল্যবান আয়াতটি ইবলিস ভুলিয়ে দিচ্ছে যে কারণে আমরা আল্লাহ পাকের সাহায্য হতে বঞ্চিত হচ্ছি। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের উচিত এই বান আয়াতটার ব্যবহার দ্বারা ইবলিসের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং ইবাদতে একান্ত ভাবে কামিয়াব হওয়া।

প্রকাশ থাকে যে, উপরের কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য পবিত্র রমজান মাসের তাৎপর্য, গুরুত্ব যেন বাকী ১১ মাসের জন্য সিয়ামের ধারাবাহিকতা সমাজ জীবনে ধরে রাখার প্রশিক্ষণ যথাযথভাবে অর্জিত হয়। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, পাক কোরআন মজিদ মোতাবেক চলা। কারণ রাসূল (সাঃ) মহান আল্লাহপাকের নির্দেশ ছাড়া কিছু বলেননি বা করেননি। আমাদের চিন্তা করতে হবে কোরআন মজিদে কোন জায়গায় লেখা নেই সূর্য্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে ইফতার করতে হবে। খুব আগের কথা মুরাক্বিরা দেহের লোম যখন চোখে দেখতে পেতেন না অর্থাৎ পশ্চিম আকাশের লাল বর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হতো তখন ইফতার করতেন। এর সাথে কিন্তু কোরআন মজিদে মিল ১৪ আছে। এখন তা হচ্ছে না, বিষয়টি ভেবে দেখার বিষয় নয় কি? আযানের পরে নামায তারপর ১৫ মিনিট পরে অন্ধকার হবে তারপর ইফতারেরও সঠিক সময় হবে রাতের অন্ধকারে। এবার



দেখুন রাতের অন্ধকার যেমন কোরআন মজিদে উদ্ভূত আছে, তাই আমার অনুরোধ আর রোযা নষ্ট হতে দিবেন না। কারণ রোযার প্রতিদান মহান আল্লাহ নিজ হাতে দেন। কোরআন মজিদের ২য় পারায়, সুরা আল বাকারার ১৮৭ নম্বর আয়াতের মধ্যে লেখা আছে “সুম্মা আতিম্মুস সিয়ামা এলাল লাইল”। এর অর্থ হলো রোযাকে পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। দিবা- রাত কাকে বলে তার পরিচয় পাবেন ৯২ নং সুরার ‘আল লাইলে ইজা ইয়াগসা’ এর অর্থ হলো রাতের শপথ যখন তা আঁধারে ঢেকে যায়, ২নং আয়াতে ‘আল্লাহরে ইজা তাজাল্লা’ অর্থাৎ দিনের শপথ যখন তা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সুরা বণি ইসরাইলের ১২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, এবং আমি দিন ও রাত্রিকে করিয়াছি দুই নিদর্শন, এবং রাত্রির নিদর্শনকে করিয়াছি অন্ধকার এবং দিনের নিদর্শনকে করিয়াছি আলোময় যেন তোমরা দিবাভাগে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে অনুগ্রহ অব্বেষণ করিতে পার। মহান আল্লাহ আমাদের বোধশক্তি বৃদ্ধি করুন। (সূত্র: পাক্ষিক ফজর, পৃষ্ঠা: ৪; ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭; জনাব এস, এ, এম, এম মঈনুল ইসলাম ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কো-অর্ডিনেটর (ইউ, এম, ও)।

কালাম পাকের বর্ণনা এবং হাদীস শরীফের বর্ণনা মোতাবেক খুব গভীরভাবে হিসাব করলে দেখা যায় সূর্যাস্তের যে সময়টা পঞ্জিকায় দেখানো আছে সারা বছরই উক্ত সময়ের ১৫ মিনিট পর প্রকৃত মাগরিবের সময় হয়। সূর্যাস্তের সাথে সাথেই মাগরিবের সময় হয় না পূর্ব আকাশে ধোয়া রাশির যে কথা বলা আছে তা সূর্যাস্তের ১৫ মিনিট পর দেখা যায়। পশ্চিম দিকে সূর্য পূর্ণাঙ্গভাবে অস্তমিত হবার কথা। ১৫ মিনিট পর স্পষ্ট দেখা যায়, বোঝা যায়। হাদীস শরীফে তারকারাজির পূর্ব মুহূর্তে ইফতারির কথা বলা আছে। ঐ সময়টা হয় ১৫ মিনিট পর। প্রকৃত মাগরিবের সময় হয় যখন তখনই ইফতারির সময় হয়। এ বিষয়ে বছরের ১১ মাস কেহ মাথা ঘামায় না। প্রয়োজনও বোধ করে না। বেশি গোলমালও হয় না। বছরের ১১ মাস বি, টি, ইউ রেডিও বিভিন্ন মসজিদ ঠিক সূর্যাস্তের সাথে সাথে মাগরিবের আযান দেয় না। সূর্যাস্তের বেশ পরেই মাগরিবের আযান দেয়। এতে বেশি হেরফের হয় না। কিন্তু মহাসমস্যা দেখা যায় রমযান মাসে তাড়াতাড়ি ইফতার করা মোস্তাহাবের দোহাই দিয়ে মাগরিবের প্রকৃত সময়ে ১৫ মিনিট আগে ইফতার খাওয়া শুরু

করে। আর ইফতারি খায় ১৫/২০ মিনিট ধরে। তাড়াতাড়ি মানে ইফতারি খেতে ২/১ মিনিট সময় ব্যয় করা। নিয়ত করে রোযা ভঙ্গ করে সামান্য কিছুমুখে দিয়ে নামাযে দাড়িয়ে যাওয়া। নামায অন্তে ভক্ষণ করা। যদি এই সকল দিক সঠিকভাবে হিসাব করা যায় তবে দেখা যায় এই ভুলের কারণে বাংলাদেশের ও যাহারা এই নিয়মের অনুসরণ করছে তাদের সকলের রোযা নষ্ট হয়ে যায়। তাড়াতাড়ির হক আদায় হচ্ছে না এবং সময়ের আগে ইফতার করা হচ্ছে। কালাম পাকে সুরা বাকারায় পরিস্কার লেখা আছে রাতের বেলায় ইফতার খেতে হবে। এই রাত সূর্যাস্তের সাথে সাথে হয় না। এ বিষয়ে সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রতি এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন- এর প্রতি সবিনয় অনুরোধ, ভালোভাবে হিসাব- নিকাশ, পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে এবং পর্যালোচনা করে এখন থেকে আগামী রমজানের ইফতারির সঠিক সময় ঘোষণা দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। যদি বিষয়টি পর্যালোচনা না করে পূর্বের মতই ভুল সময়ে ইফতারির সময় ঘোষণা দেয়া হয় তবে সকলের রোযা নষ্টের জন্য হাশরের মাঠে জনগনসহ সরকারকেও দায়ী করা হবে। (সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১শে আগষ্ট ২০০৬, ঢাকা: বৃহস্পতিবার ১৬ ভাদ্র ১৪১৩; প্রচারে: সরকার শামছুল আরেফিন, প্রাক্তন হি.র.ক.ইআরডি, বাসা- ৬/১৪৬, রূপনগর টিনসেড, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬)।

গত ৩১ আগষ্ট দৈনিক ইনকিলাবের চিঠিপত্র কলামে সরকার শামছুল আরেফিনের ‘সূর্যাস্ত এবং মাগরিবের সময় প্রসঙ্গে’ শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। লেখাটির শিরোনাম যাই হোক লেখাটি মূলত ইফতার সম্পর্কিত। লেখাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং লেখকের সময়োচিত পরামর্শ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১৯৮২ সালে প্রকাশিত মুয়াত্তাগ্রন্থ ও ১৯৯১ সালে প্রকাশিত বুখারী শরীফের রোযার অধ্যায়। মা’আরেফুল কোরআন ও তাহফিমূল কোরআন- এর ইফতার সম্পর্কিত সুরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা অধ্যয়ন করি। এগুলোতে ইফতারের তেমন সুনির্দিষ্ট কোন সময়ের উল্লেখ বর্ণিত হয়নি। শুধু ইমাম মালিক (রহ.)এর ‘মুয়াত্তা’ গ্রন্থের ইফতার অধ্যায়ে তিনটি রেওয়াজ বর্ণিত হয়েছে। রেওয়াজ ৬৯২ ও ৬৯৩- এর বর্ণনা নিম্নরূপঃ

সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী (রা) হইতে বর্ণিত - রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেনঃ সর্বদা লোক মঙ্গলের উপর থাকিবে যতদিন ইফতার সত্বর করিবে। (সূত্র: মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র), ১ম খণ্ড, রেওয়াজত: ৬৯২ ও ৬৯৩, পৃষ্ঠা: ২৩৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

হুমায়দ ইবন আব্দুর রহমান (র) হইতে বর্ণিত - উমর ইবন খাত্তাব (রা) এবং উসমান ইবন আফফান (রা) উভয়ে মাগরিবের নামায পড়িতেন, এমন সময় তখন তাঁহারা রাত্রির অন্ধকার দেখিতে পাইতেন। (আর ইহা হইত) ইফতার করার পূর্বে। অতঃপর তাঁহারা (উভয়ে) ইফতার করিতেন। আর ইহা হইত রমযান মাসে। (সূত্র: মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র), ১ম খণ্ড, রেওয়াজত: ৬৯৪ পৃষ্ঠা: ২৩৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

হাদিসের ব্যাখ্যা নিম্নপ্রয়োজন। কোরআনে কি বলা হয়েছে। সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'সুম্মা আতিমুস্ সিয়ামা ইলাল লাইল' অর্থাৎ নিশাগম পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। আরবীতে 'সাম' ও 'আসল' শব্দের অর্থ সন্ধ্যা। আয়াতে এর কোনটিই ব্যবহৃত হয়নি। অথচ রমযান মাসে যখন আমরা ইফতার করি তখন কিছুতেই রাত বা নিশাগম শুরু হয় না, সন্ধ্যা হয় মাত্র। সূর্যাস্তের ১৫- ২০ মিনিট পরেই কেবল রাত বা নিশাগম শুরু হয়। কোরআনের আয়াতের সঙ্গে মুয়াত্তা গ্রন্থের ৬৯৪ রেওয়াজতের যথেষ্ট মিল রয়েছে, যা অন্য দুটির সঙ্গে নেই। আর খলীফা উমর (রা) এবং উসমান (রা) নিশ্চয়ই রাসূল (সা) এর ইফতারের সময় অনুসরণ করেছেন। তাহলে আমরা কি প্রকৃতপক্ষে রাসূল (সা) বা খলীফাদের অনুসরণ করছি? নিশ্চই না। আরেকটি বিষয় উপলব্ধি করা দরকার যে, আযান দেয়ার অর্থ নামাযের জন্য আহ্বান। নামায পড়া, ইফতার করা নয়। ১১টি মাস মাগরিবের আযান দিলে নামায পড়া হয় কিন্তু রমযান মাসে তড়িঘড়ি করে শুরু হয় ইফতার। কী বিপদ! আশ্চর্যের বিষয় হলো, অন্য মাসে মাগরিবের আযান দেয়া হয় সূর্যাস্তের ৮/১০ মিনিট পরে, রমযান মাসে মাত্র ২/৩ মিনিট পরে। প্রায় ১৪ ঘণ্টার বেশি রোযা রেখে সামান্য ১৫/২০ মিনিটের জন্য তাড়াহুড়া করে সম্পূর্ণ রোযাটিকে নষ্ট করার কোন অর্থ থাকতে পারে না। খলিফাদের ইফতার করার মধ্যে তাড়াহুড়া করার চিহ্ন আমরা দেখতে পাই না। সূরা বনী ইসরাইলের ১১ নং আয়াতে মানুষকে তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আর মানুষ (যেভাবে নিজের জন্যে না বুঝে) অকল্যাণ কামনা করে, (তেমনি সে) তার (নিজের) জন্যে (বুঝে সুঝে) কিছু কল্যাণও (কামনা করে আসলে) মানুষ (কাংখিত বস্তুর জন্যে এমনিই) তাড়াহুড়ো করে। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ১১, শূরা নং: ১৭)।

কিন্তু তাইই (তাড়াহুড়া) করা হচ্ছে। আর শয়তানের কৌশল তো বড়ই জটিল ও কুটিল। এ ব্যপারে সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের অনুরোধ করছি, আপনারা ভেবে দেখুন এবং এ বিষয়ে যথাযথ সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক মুসলমানদের ঈমান-আকিদা ও ইবাদতসমূহ সঠিক পন্থায় পালন করার প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করুন। (সূত্র: দৈনিক ইনকিলাব, মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬, প্রচারে: মোঃ আশরাফ আলী, ৬৬২/২ পঃ কাজীপাড়া, ঢাকা- ১২১৬)।

এখন যদি আমরা কোরআনিক ব্যাখ্যার সাথে সাথে হাদিসের সহায়তা গ্রহণ করি তাহলে তা থেকেও প্রমাণিত হয় যে আমাদেরকে রোযা রাত্রি পর্যন্ত পূর্ণ করতে হবে। যেমন: পবিত্র হাদিস গ্রহণে ‘মুয়াত্তায়ে মালেক’ এর হাদিসে বলা হয়েছে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) মাগরিবের নামায পড়তেন এমন সময় রাত্রির অন্ধকার দেখতে পেতেন আর ইহা ইফতার করার পূর্বে। অতঃপর তারা উভয়ে ইফতার করতেন। আর ইহা রমজান মাসে। (এ শিক্ষা উনারা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর কাছ থেকে শিখে ছিলেন)। (সূত্র: মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র), ১ম খণ্ড, রেওয়াজত: ৬৯৪ পৃষ্ঠা: ২৩৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

আহলে কিতাবদের ইফতারের সময় হল আসমানের তারকাসমূহ যখন স্পষ্ট হয়ে উঠে তখন। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুস সাওম, পৃষ্ঠা: ২৪২, হাদীস: ১৮১৮ এর ১৫নং টিকা, আধুনিক প্রকাশনী)।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, যখন দেখবে যে এদিক (পূর্বদিক) থেকে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন বুঝবে রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে গিয়েছে। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুস সাওম, পৃষ্ঠা: ২৪২, হাদীস: ১৮১৬, ১৮১৭, আধুনিক প্রকাশনী)।

যেহেতু এখানে প্রমাণ রয়েছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) উভয়েই মাগরিবের নামাজ শেষ করে যখন রাত্রে অন্ধকার দেখতে পেতেন তখন ইফতার করতেন। এবং আহলে কিতাবদের ইফতারের সময়ও যখন আসমানের তারকা স্পষ্ট দেখা যায় আর রাতের অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে তখন আর এখন যারা খলিফাদের অনুসরণ ছাড়া, রাতের অন্ধকার ও তারকাসমূহ দেখাতো দূরের কথা মাগরিবের আযানের সাথে সাথে আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকা অবস্থায় ইফতার করেন তারা কি ঠিক করছেন? নাকি খলিফারাই অনতিবিলম্বে ইফতার না করে ঠিক করতেন? কারণ দুটি পক্ষ কখনও এক হতে পারে না। যদি সেইসব অনতিবিলম্বকারীদের কথামত আগে করাটাই সঠিক তাহলে কি কোরআন ভুল বলছে? (নাউয়ুবিল্লাহ) যে, ‘তোমরা লাইল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর’ (অর্থাৎ অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত) ও খোলাফায়ে রাসেদীনের দুই মহান নেতারা হযরত কোরআনের সেই অন্ধকারকে অনুসরণ করেই দেরি করে ইফতার করে কি কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন? আর যদি কোরআন ও খলিফা হযরত উমর ও উসমানের সময় ঠিক থাকে তাহলে যারা সময়ের পূর্বেই ইফতার করছেন, সেই ক্ষেত্রে মানতে হবে তাহারা ভুল ও বিভ্রান্তিতে রয়েছেন। আর বিবেকবান ব্যক্তিকেতো অবশ্যই খোদার হুকুম ও কোরআনকে অনুসরণ করা উচিত। কোরআনে উল্লেখিত সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের বিরোধীতা ঈমান হীনতারই নামান্তর, কুফরী বৈ অন্য কিছুই নয়।

কিন্তু এখানে আবার ‘সাহল ইবনে সা’দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যতদিন লোকেরা সূর্য অস্ত যাওয়ার পর অনতিবিলম্বে ইফতার করবে ততদিন পর্যন্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুস সাওম, পৃষ্ঠা: ২৪২, হাদীস: ১৮১৮, আধুনিক প্রকাশনী)।

আসেম ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তার পিতা উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে সময় এদিক (পূর্বদিক) থেকে অন্ধকার হয়ে আসছে বলে মনে হবে আর এদিক (পশ্চিম দিক) থেকে দিনের আলো তিরোহিত বা অদৃশ্য হবে এবং সূর্য

অন্ত যাবে তখন রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে যায়। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুস সাওম, পৃষ্ঠা: ২৪১, হাদীস: ১৮১৫, আধুনিক প্রকাশনী)।

আবার আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সফর সঙ্গী ছিলাম। তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। সূর্য ডুবলে তিনি এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন তুমি সওয়ারী থেকে নেমে আমাদের জন্য ছাতু গুলে আন। সে বলল, হে আল্লার রসূল, সন্ধ্যা হতে দিন। তিনি [রাসূলুল্লাহ (সাঃ)] বললেন, তুমি গিয়ে আমাদের জন্য ছাতু গুলে আন। সে লোক বলল, হে আল্লার রসূল, এখনো তো দিন অবশিষ্ট আছে? তিনি [রাসূলুল্লাহ (সাঃ)] আবার বললেন, যাওনা আমাদের জন্য ছাতুগুলে আন। হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা বলেন, সে গিয়ে ছাতু গুলে আনল। পরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, যে সময় তোমরা দেখবে রাতের অন্ধকার এদিক (পূর্বদিক) থেকে ঘনিয়ে আসছে তখন জানবে, রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) (এ দিক থেকে বলায় সময়) তার আঙ্গুল দ্বারা পূর্বদিকে ইশারা করে দেখালেন। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪২, হাদীস: ১৮১৭, আধুনিক প্রকাশনী)।

আল কোরআনে সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতের বিশ্বাসীগন আপনারা দেখুন উপরে যে হাদীসটি সহীহ আল বুখারীর মত কিতাবে উল্লেখ রয়েছে সেখানে রাসূল (সাঃ) - কে একজন সাধারণ ব্যক্তি থেকেও খাট করা হয়েছে। কারন সে রাসূল (সাঃ) - কে বার বার বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ সময়ত এখনো হয়নি, সন্ধ্যা হতে দিন' তারমানে সে এতটুকু নিশ্চিত যে 'দিন এখনো অবশিষ্ট আছে'। এখানে যেহেতু 'দিন' উল্লেখ রয়েছে তাহলে কি রাসূল (সাঃ) দিন থাকতেই রোযাকে খুলে ফেলেছেন? কারন হাদীসটি মনোযোগ সহকারে পড়লে বুঝা যায় যে সেই ব্যক্তিটি এতই নিশ্চিত ভাবে বলছে যেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর মত একজন নবীর হয়তো ভুল হচ্ছে? (নাউয়ুবিল্লাহ) এতবার বলা সত্ত্বেও যখন রাসূল মানেননি বললেন 'যাওনা' (অর্থাৎ জোরজবরদস্তি পাঠানো হচ্ছে তাইনা?) তখন সে গিয়ে ছাতু গুলিয়ে আনল। আর এ কথা সত্য ও প্রমানিত যে আহলে সুনাত ওয়াল জামাত, আহলে হাদীস ও ওয়াহাবী ফেরকা সমূহের আলেম ওলেমাগন এমনকি

সাধারণ অনুসরণকারীগণের মধ্যে হয়তো অধিকাংশই বিশ্বাস করেন যে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দ্বারাও ভুল হয়েছে। কিন্তু শুধু মাত্র শিয়া মাযহাবের অনুসরণকারী বাদে। কারন তারা কখনো স্বপ্নেও ভাববেন না যে রাসূলের দ্বারা কোন ভুল হয়েছিলো।

সহীহ আল বুখারীর আরেকটি হাদীসের ব্যাখ্যাটি দেখুন: ‘কোরআন হাদীসের বিধান হল ইফতারের ব্যাপারে জলদি করা ও সেহরীর ব্যাপারে বিলম্বকরা। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুস সাওম, পৃষ্ঠা: ২৪২, হাদীস: ১৮১৮ এর নিচের ১৫নং টিকা, আধুনিক প্রকাশনী)।

বাহ! কি সুন্দর ব্যাখ্যা। হাদীস কে গড়মিল করতে করতে এখন আবার কোরআনের মত পবিত্র কিতাবকে নিয়েও? হাদীসের ব্যাপারেতো বহু হাদীসই আমরা লক্ষ্য করেছি যে কোরআনের সাথে মিল খায় না। কিন্তু ‘কোরআন’ এই শব্দটি আবার কোথা থেকে আসল ভাই? কোরআনের কোন জায়গায় উল্লেখ আছে যে ইফতারের ব্যাপারে জলদি করা আর সেহরীর ব্যাপারে দেরি করা? (ব্যাখ্যাটি তাদের কাছ থেকে একটু বুঝে নিন তো)। কারণ সহীহ আল বুখারী হচ্ছে সিয়াহ সিন্তার প্রথম স্তরের কিতাব এবং সিয়াহ সিন্তার কোন হাদীসই নাকি ভুল নয় সবই নির্ভুল। তাহলে এখানেতো দুইটি দিক ভাগ হয়ে গিয়েছে যেমন আল্লাহ কোরআনে বলছেন রাত পর্যন্ত, আর ইমাম ইসমাঈল বুখারী তার সিয়াহ সিন্তাহ কিতাব সহীহ আল বুখারী শরীফে বলছেন জলদি করতে, কোনটি মানবো সহীহ আল বুখারী নাকি আসমানি কিতাব আল কোরআন? কোরআনে উল্লেখ আছে “আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণ রেখা থেকে উষার শুভরেখা তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর রাত্রি সমাগম পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ কর। (সূরা বাকারা: ১৮৭) আয়াতে আছে “এলাল লাইল” অর্থাৎ রাত পর্যন্ত। এলাল মাগরিব পর্যন্ত নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরা মাগরিবের আযানের সাথে সাথে ইফতার করে ফেলে, তার আগে সর্বপ্রথম মোয়াজ্জিন ইফতার করে আযান দেয়। আবার কেউ মাইকে আযান দেওয়ার পূর্ব মূহুর্তে টক টক শব্দ শুনা মাত্র মুখে পানি দেয় (প্রমানিত)। রাত্রি শুরু হয় মাগরিবের সময়ের ১৫- ২০ মিনিট পরে। এখন যদি উপরের বিবৃতির উপর ফতোয়া (ধর্মীয় বিধান

অনুসারে) জারি করা হয় তাহলে সবাই বলবে আল্লাহর নির্ধারিত সময় অনুযায়ী একটু দেরীতে রোযা খুললে রোযা মাকরুহ (ঘৃণীত) হবে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগে রোযা খুললে তা ভেঙ্গে যাবে। আর সারা দিনের রোযা বেকার হয়ে যাবে। রোযাকে সম্পূর্ণ ভাবে পরিপূর্ণ করতে হলে প্রত্যেক রোযাদারকে কোরআন ও আল্লাহর কথামত ‘রাত হতে রাত’ অর্থাৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কারণ উক্ত আয়াতে খোদা (লাইল) বলেছেন অর্থাৎ ‘রাত’। এবং মাগরিবের আযানের সময়টিকে আমরা সন্ধ্যা বলি কোরআনে সন্ধ্যাকে (আসীল) বলা হয়েছে। তাই মাগরিবের আযানের সাথে রোযাকে পূর্ণ করার বা ইফতার করার কথা উল্লেখ নেই। আর যে সময় মাগরিবের আযান দেওয়া হয় সে সময় আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে। সেই সময়টিকে আমরা রাত অর্থাৎ (লাইল) হিসেবে ধরে নিতে পারি না। সুতরাং এই ব্যাপারে সবাইকে চিন্তা করা উচিত।

আল্লাহ কোরআনে বলছেন: ‘আমি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষ পয়দা করিয়াছি। তাহাদের অন্তর আছে কিন্তু তাহারা তাহা দ্বারা বুঝিতে চায় না, তাহাদের চোখ আছে, কিন্তু তাহারা উহা দ্বারা দেখে না এবং তাহাদের কান আছে, তাহারা শুনিতে চায় না উহা দ্বারা। উহারা জানোয়ার বরং পশুর চেয়েও অধম, উহারাই বেখেয়াল থাকে। (সূরা আরাফ, আয়াত: ১৭৯, শূরা নং: ৭)।

এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা সত্য পথ দেখাইয়া দেয় এবং তাহারাই সত্যের সহিত বিচার করে। (সূরা আরাফ, আয়াত: ১৮১)।

কিন্তু অধিকাংশই এতকিছু জানা সত্ত্বেও বলে থাকেন ‘তাহলে এত মানুষকি ভুলের মধ্যে রয়েছে তাহারা কি ভুল সময় পালন করছেন? কিন্তু আল্লাহ বলছেন: “এবং যদি তুমি দুনিয়ায় অধিকাংশ লোকের কথা মান্য কর তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিপথে লইয়া যাইবে, তাহারা শুধু খামখেয়ালের অনুসরণ করে এবং অনুমান করিতেছে মাত্র। (সূরা আনআম, আয়াত: ১১৬)।



উপরোক্ত কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ এবং হাদীসসমূহের ভিত্তিতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদেরকে লাইল অর্থাৎ রাতে (বর্তমান সুন্নত আল জামাতে মসজিদ সমূহের আযানের ১৫ থেকে ২০ মিনিট পর) ইফতার করতে হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং অন্যান্য খোলাফায়ে রাসেদীনগণ ও তাদের জীবদ্দশায় রাতে ইফতার করেছেন (যার দলিল উপরে উল্লেখ করা হয়েছে)। ইনশাআল্লাহ আমরাও কোরআনের নির্দেশিত সময় ইফতার করব।

## সেহরীর সময়সীমা প্রসঙ্গে

“হাভা ইয়াতাবাইয়ানা লাকুমুল খাইতুল আবইয়াত্ব মিনাল খাইত্বিল আস্ওয়াদি মিনাল্ ফাজ্জরি” অর্থাৎ আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণ রেখা হইতে উষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। (সূত্র: আল কোরআন, সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭, শুরা নং: ২)।

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। নবী (সাঃ) বলেছেন, তোমরা সেহরী খাও সেহরীতে বরকত লাভ হয়। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুস সাওম, পৃষ্ঠা: ২৩০, হাদীস: ১৭৮৭, আধুনিক প্রকাশনী)।

সাহল ইবনে সা’দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি বাড়ীতে পরিবার পরিজনদের মধ্যে সেহরী খেতাম। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে ফজরের নামায পড়ার জন্য তাড়াহুড়া করে খেতাম। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুস সাওম, পৃষ্ঠা: ২২৯, হাদীস: ১৭৮৪, আধুনিক প্রকাশনী)।

সেহরী খাওয়াতে বরকত ও কল্যাণ লাভ হয়। তবে সেহরী খাওয়া ওয়াজিব নয়। কেননা, নবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদের ক্রমাগতভাবে রোযা রাখা সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সেহরীর উল্লেখ নাই। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুস সাওম, পৃষ্ঠা: ২২৯, অনুচ্ছেদ, আধুনিক প্রকাশনী)।

পবিত্র কোরআনে “হাভা (যতক্ষণ), ইয়াতাবাইয়ানা (স্পষ্ট হয়ে যায়), লাকুমুল (তোমাদের জন্যে) খাইতুল্ (রেখা), আবইয়াত্ব (সাদা অর্থাৎ সুবেহ সাদেক)” আয়াতে রাতের অন্ধকারকে কালো রেখা এবং ভোরের আলো ফোটাকে সাদা রেখার সাথে তুলনা করে রোযার শুরু এবং খানা-পিনা হারাম হওয়ার সঠিক সময়টি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু এ সময়সীমার মধ্যে বেশ-কম হওয়ার সম্ভাবনা যাতে না থাকে সেজন্য ‘হাভা ইয়াতাবাইয়ানা’ শব্দটিও যোগ করে দেয়া হয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সন্দেহপ্রবণ লোকদের ন্যায় সুবেহ-সাদেক

দেখা দেয়ার আগেই খানা- পিনা হারাম মনে করো না অথবা এমন অসাবধানতাও অবলম্বন করো না যে, সুবহে- সাদেকের আলো ফুটে উঠার পরও খানা- পিনা করতে থাকবে। বরং খানা- পিনা এবং রোযার মধ্যে সুবহে- সাদেকের উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খানা- পিনা বন্ধ করা জরুরী মনে করা যেমন জায়েজ নয়, তেমনি সুবহে- সাদেক উদয় হওয়ার ব্যাপারে একীন হয়ে যাওয়ার পর খানা - পিনা করাও হারাম এবং রোযা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ তা এক মিনিটের জন্যে হলেও। সুবহে- সাদেক উদয় সম্পর্কে একীন হওয়া পর্যন্তই সেহরীর শেষ সময়। (সূত্র: পবিত্র আল কোরআনুল করীম, পৃষ্ঠা: ৯৫, মূলঃ তফসীর মাআরেফুল কোরআন, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহঃ), অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সউদী আরবের মহামান্য শাসক খাদেমুল- হারামাইনিশ শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ ইবনে আবদুল আজীজের নির্দেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পবিত্র কোরআনের এ তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর মুদ্রিত হলো)।

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি আসার (সাহাবাগণের উক্তি) জটিলতার অবতারণা করেছে। যেমন হযরত আলী (আঃ) থেকে প্রমাণিত হয়েছে, তিনি ফজরের নামায সমাপ্ত করার পর বলতেন, এখন শুভরেখা ও কৃষ্ণ রেখার পার্থক্য সূচিত হয়েছে। এই বর্ণনাটি করেছেন ইবনে মুনজির। তিনি বিশুদ্ধ সূত্রে হজরত আবু বকরের উক্তি হিসেবে আরো বর্ণনা করেছেন, যদি পানাহারের আগ্রহ অনুভব না হতো তবে আমি সাহরী করতাম ফজরের নামাযের পর। ইবনে মুনজির, ইবনে আবী শাইবা হজরত আবুবকর থেকে আরো একটি বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, তিনি (হজরত আবুবকর) ফজর সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত গৃহের দরোজা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণিত আসারগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, সুবহে সাদেক হওয়ার পরও পানাহার করা যায়। এ জটিলতা নিরসনের উপায় কী? আমি বলি, অদৃশ্যের সংবাদ আল্লাহপাকই ভালো জানেন। তবে আমার মতে, এসকল আসার দ্বারা বোঝা যায় মিনাল ফাজরি কথাটির মিন অব্যয়টির অর্থ, হজরত আবুবকর ও হজরত আলীর নিকট সববীয়া বা কারণ সঙ্গত। আর খাইত অর্থ প্রকৃত রেখা। অথচ হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে মিন অব্যয়টির অর্থ বর্ণনামূলক বা বয়ানিয়া। আর ‘খাইতিল আবইয়াদ’ অর্থ সুবহে সাদেক। এই সমাধানটির ঐকমত্যাগত। (সূত্র: তাফসীরে

मायहारी, १म खणु, पृष्ठा: ७८७, कायी छानाउल्लाह पानिपथी (रह), सेरहिन्द प्रकाशन,  
८९- योगीनगर रोड, उयारी, टाका- १२०७)।

## সাদকাতুল ফিতরা প্রসঙ্গে

অন্যান্য আহকামের মত ফিতরার ও কোরবাতের শর্ত আছে। ফিতরা বালেগ, আকেল, স্বাধীন, স্বনির্ভরের ব্যক্তির উপর ওয়াজেব। ফেতরার আহকাম হচ্ছেঃ (১) যদি শাওয়ালের পহেলা চাঁদের (ঈদের চাঁদ) উদয়ের রাত্রিতে সূর্যস্তের সময় কোনো ব্যক্তি কারো ঘরে আসে, যদি সে এক সেকেন্ড আগেও আসে এবং আকেল, ও বালেগ হয় শুধু মাত্র পরোধীন ও ফকির বাদে বাকী সকলের উপরে ফেতরা দিতে হবে। (২) যদি কোন ব্যক্তি নিজের এবং নিজের পরিবারের সারা বৎসরের খরচ বহন করতে না পারে এবং রোজগার করার সামর্থ না থাকে তাহলে এমন ব্যক্তির উপর ফেতরা ওয়াজেব নহে। (৩) ফিতরার পরিমাপঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিন কিলো চাল, খোরমা, কিশমিশ, গম, ইত্যাদি থেকে যে কোন একটি দিতে হবে। উক্ত পরিমাপের বা টাকা দিতে চাইলেও দিতে পারবে। (৪) যারা সৈয়দ নয় তারা গায়েরে সৈয়দ বা সৈয়দের ফেতরা গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু যারা সৈয়দ তারা গায়েরে সৈয়দের ফেতরা গ্রহণ করতে পারবেন না। (৫) যারা ফেতরা পাওয়ার হকদার তাদেরকে কমপক্ষে একজনের পূর্ণ ফেতরা দিতে হবে। (সূত্র: রমজানুল মোবারক, ১১২তম পৃষ্ঠা, প্রকাশনায়: নুরস সাকলায়েন জন কল্যাণ সংস্থা, ঢাকা, বাংলাদেশ)।

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলিম দাস ও স্বাধীন ব্যক্তি নর ও নারী এবং বালক ও বৃদ্ধের ওপর সদকায়ে ফিতর (রোযার ফিতরা) এক, সা (এ দেশীয় ওজনে এক সা' সমান তিন সের এগার ছটাক) যব নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তিনি এটাও আদেশ করে দিয়েছেন যে, লোকদের ঈদের নামাযে যাবার পূর্বেই যেন তা আদায় করা হয়। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী ২য় খণ্ড, হাদীস: ১৪০৬, পৃষ্ঠা: ৬১)।

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলিম নর- নারী স্বাধীন ও গোলাম প্রত্যেকের উপর সদকায়ে ফিতর এক, সা (তিন সের এগার ছটাক) খেজুর অথবা এক, সা যব নির্ধারিত

করে দিয়েছেন। (সূত্র: সহী আল বুখারী, ২য় খণ্ড, হাদীস: ১৪০৭, পৃষ্ঠা: ৬১, আধুনিক প্রকাশনী)।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমরা সদকায়ে ফিতর বাবত এক, সা (তিন সের এগার ছটাক) যব খাওয়ায়ে দিতাম। (সূত্র: সহী আল বুখারী, ২য় খণ্ড, হাদীস: ১৪০৮, পৃষ্ঠা: ৬১, আধুনিক প্রকাশনী)।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সময়ে) সদকায়ে ফিতরা বাবদ (মাথাপিছু) এক সা' (তিন সের এগার ছটাক) পরিমাণ খাবার অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' পনির অথবা এক সা' কিশমিশ প্রদান করতাম। (সূত্র: সহী আল বুখারী, ২য় খণ্ড, হাদীস: ১৪০৯, পৃষ্ঠা: ৫৮, আধুনিক প্রকাশনী)।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, নবী (সাঃ) সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' (তিন সের এগার ছটাক) খেজুর অথবা এক সা' যব প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আবদুল্লাহ বলেন যে (পরবর্তীকালে) লোকেরা (আমীর মুয়াবিয়া ও তার সঙ্গীরা) তার স্থলে দুই 'মুদ' গম (অর্থাৎ অর্ধেক সা এক সার দু ভাগের এক ভাগ যার পরিমাণ এক সের সাড়ে তের ছটাক নির্ধারিত করেছেন)। (সূত্র: সহী আল বুখারী, ২য় খণ্ড, হাদীস: ১৪১০, পৃষ্ঠা: ৬২, আধুনিক প্রকাশনী)।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, নবী (সাঃ) এর সময়ে আমরা ফিতরা বাবদ (মাথাপিছু) এক সা' (তিন সের এগার ছটাক) খাবার অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব কিংবা এক সা' কিশমিশ - মোনাক্কা প্রদান করতাম। মুয়াবিয়ার যমানায় যখন গম আমদানী হল তখন তিনি বললেন, আমার মতে এর (গমের) এক 'মুদ' অন্য জিনিসের দুই মুদের সমান (সূত্র: সহী আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, পৃষ্ঠা: ৬২, হাদীস: ১৪১১, আধুনিক প্রকাশনী)।

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ) লোকদের (ঈদের) নামাযে গমনের পূর্বেই সদকায়ে ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬২, হাদীস: ১৪১২, আধুনিক প্রকাশনী)।

সদকায়ে ফিতর মুসলিম দাস, স্বাধীন ব্যক্তি, গোলাম, ক্রীতদাস, ব্যবসার ক্রীতদাসদের, ছোট ও বড়, নর ও নারী, বালক ও বৃদ্ধের, এতিমের মাল ও পাগলের সম্পদের উপরে ফরয ও ওয়াজিব। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬১-৬২, কিতাবুয যাকাত, হাদীস: ১৪০৭, ১৪১৪, ১৪১৫ (অনুচ্ছেদ), আধুনিক প্রকাশনী; আবু দাউদ শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৭, হাদীস: ১৬১৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

আল-হায়ছাম ইবনে খালিদ (র) আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর যুগে মাথাপিছু এক সা পরিমাণ বার্লি অথবা খেজুর বা বার্লি জাতীয় শস্য, অথবা কিশমিশ সদকায়ে ফিতর প্রদান করত। রাবী (নাফে) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেনঃ অতঃপর হযরত উমার (রা)- এর সময় যখন গমের ফলন অধিক হতে থাকে, তখন তিনি আ ধা সা গমকে উল্লেখিত বস্তুর এক সা' এর সম পরিমাণ নির্ধারণ করেন। (সূত্র: আবু দাউদ শরীফ, ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, পৃষ্ঠা: ৪০৭, হাদীস: ১৬১৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

মুসাদ্দাদ (র)....আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরবর্তী কালে লোকেরা (উমারের) অর্ধ সা গম দিতে থাকে। নাফে বলেন, আর হযরত আবদুল্লাহ (রা) সদকায়ে ফিতর হিসাবে শুকনা খেজুর প্রদান করতেন। অতঃপর কোন এক বছর মদীনায় শুকনা খেজুর দুঃপ্রাপ্য হওয়ায় তাঁরা সদকায়ে ফিতর হিসাবে বার্লি প্রদান করেন। (সূত্র: বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ; আবু দাউদ শরীফ, ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, পৃষ্ঠা: ৪০৮, হাদীস: ১৬১৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা (র) আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের মাঝে (জীবিত) ছিলেন, তখন আমরা সদকায়ে ফিতর আদায়

করতাম প্রত্যেক ছোট, বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে এক সা' পরিমাণ খাদ্য (খাদ্যশস্য) বা এক সা পরিমাণ পনির বা এক সা' বার্লি বা এক সা' খোরমা অথবা এক সা' পরিমাণ কিশমিশ। আমরা এই হিসাবে সদকায়ে ফিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম, এবং অবশেষে মুআবিয়া হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। অতঃপর তিনি মিসরে আরোহণ পূর্বক ভাষণ দেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, সিরিয়া থেকে আগত দুই 'মুদ্দ' (দুই মুদ হলঃ এক সা এর অর্ধেক; অর্থাৎ একসের সাড়ে তের ছটাক) গম এক সা খেজুরের সম পরিমাণ। তখন লোকেরা তাই গ্রহণ করেন। কিন্তু আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) বলেন, আমি যত দিন জীবিত আছি সদকায়ে ফিতর এক সা' হিসাবেই প্রদান করতে থাকব। (সূত্র: বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা, নাসাঈ, আবু দাউদ শরীফ, ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, পৃষ্ঠা: ৪০৮, হাদীস: ১৬১৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

নবী (সাঃ) এর ফেতরার পরিমাণ, নবীর জীবদ্দশায় এক সা; (তিন সের এগার ছটাক) প্রদান করিতেন, নবীর (সাঃ) এর ওফাতের পর মুসলমানদের ও খলিফাদেরও একই নিয়ম ছিল, কিন্তু হযরত উমরের সময় ও মুয়াবিয়া যখন রাজতন্ত্র কায়েম করলেন তখন নবীর সুলতকে বদলে দিলেন ও নিজের মত নিয়ম জারী করলেন। এখন আপনাদের সামনে প্রশ্ন স্বরূপ সহীহ আল বুখারী ও আবু দাউদ থেকে উল্লেখ করা হল যে, নবী (সাঃ) এর ফিতরার পরিমাণ এক সা' (তিন সের এগার ছটাক)। কিন্তু মুয়াবিয়ার প্রদত্ত অর্ধেক সা (এক সের সাড়ে তিন ছটাক) দিতেন। এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমরা কার অনুসরণ করবো? আল্লাহর নবী (সাঃ) এর নাকি মুয়াবিয়ার? এটা যার যার বিবেকের ব্যাপার। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন আমি সব সময় এক সা- ই দিব রাসূল (সাঃ) এর জীবদ্দশায় আমরা ঐ পরিমাণ ফিতরা দিতাম। অর্থাৎ রাসূলের সময় তাদের যে খাদ্য ছিল সেটার উপর তারা ফিতরা দিতেন। যেমন আমাদের দেশে প্রধান খাদ্য চাল। কিন্তু দেয় গম, (কম দামী খাবার)। আমরা কেন গরীবকে ঠকানো, আবার সবাই কিন্তু এক দামের চাল খায়না, কেউ খায় বাসমতি চাল, কেউ খায় নাজিরশাইল প্রিমিয়াম, কেউ খায় পোলাওয়ার চাল, আবার কেউ খায় সাধারণ ১৮ থেকে ৪০ টাকা কেজি



দামের চাল। এই হিসাবে ফেতরা বের হয়। কিন্তু তা না করে নিজের ইচ্ছেমত ফেতরা বের করতে হবে, এটা কি রকম ইনসাফ? রাসূল (সাঃ) এর বিশিষ্ট সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) মুয়াবিয়ার প্রদত্ত (দ্বীনে পরিবর্তন বা নতুন সংযোজন বেদআত) মানতে অস্বীকার করেন। কিন্তু আবু সাঈদ খুদরীর হাতে কোন ক্ষমতা ছিলনা। ক্ষমতা কুক্ষিগত ছিল মুয়াবিয়া ও তার উমাইয়া বংশের হাতে। আর তারই ফলে আমাদের কাছে রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাত না এসে এসেছে মুয়াবিয়ার সুন্নাত। আজ অধিকাংশ মুসলমানরা নবী (সাঃ) এর প্রদত্ত সুন্নাত অনুসরণ না করে বেদআত ফিতরা অনুসরণ করছে। যেমন এক সার' বদলে অর্ধ সা' ফিতরা দিচ্ছে এবং উদাহরণ দিচ্ছেন যে দুই মুদ্দ এক সা'র সমান। তখনকার যুগে কিশমিশ, খোরমা তাদের খাদ্য ছিল তাই তারা সেই খাদ্য অনুসারে ফিতরা প্রদান করত পরবর্তীকালে লোকেরা আধা সা' গমকে এর (এক সা' খেজুরের) সমান ধরে নিয়েছেন। সকল সহীহ হাদীস অনুযায়ী সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) - এ ফিতরার পরিমাণ সমান কিন্তু পণ্য ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ পণ্য নয়, পরিমাণ- ই মূল বিবেচ্য বিষয়। তাই সুন্নাতে রাসূল হিসেবে নবী (সাঃ) এর প্রদত্ত এক সা ফিতরা আমাদেরকে দিতে হবে যার পরিমাণ (তিন সের এগার ছটাক) সচেতন মুসলমান বিষটি ভেবে দেখবেন।

১ সা' = এ দেশীয় ওজনে ১ সা' সমান ৩ সের ১১ ছটাক = ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম × ৪০.০০ = ১৩২/- (একশত বত্রিশ টাকা)।

২ 'মুদ্দ' = ১ সা'র অর্ধেক, অর্থাৎ ১ সের সাড়ে ১৩ ছটাক = ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম × ৪০.০০ = ৬৬/- (ছষটি টাকা)।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, সাহাবারা আদায়কারীর নিকট ফিতরা জমা দিতেন, সরাসরি গরীবদেরকে দিতেন না। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, পৃষ্ঠা: ৬৩, হাদীস: ১৪১৪, আধুনিক প্রকাশনী)।

আল্লাহ এরশাদ করছেন “হে মুম্বীনগন, তোমরা আল্লাহর অনুগত্য কর এবং রাসূলের অনুগত্য কর তোমরা তোমাদের কর্মফল বিনিষ্ট করো না (সূত্র : আল কোরআন, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৩৩)।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে এই প্রার্থনা যে, আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার নবীর প্রদত্ত সঠিক ফেতরা প্রদান করে রোযার হক আদায় করার তৌফিক দান করুন, মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদ ‘আহলে বায়তের’ পথে চলার ও জানার তৌফিক দান করুন।

## যাকাত প্রসঙ্গে

পবিত্র আল কোরআনে যাকাতকে ফরয করা হয়েছে মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘ওয়া আক্বীমুস সালাতা ওয়া আতুজ যাকাতা’ অর্থাৎ- তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৩, শূরা নং: ২)।

যাকাতকে ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ বলা হয়। আরবী যাক্বা শব্দ থেকে যাকাত যার অর্থ পবিত্র করা। যাকাত শব্দের অভিধানিক অর্থ নমু (বৃদ্ধি পাওয়া এবং পবিত্র করা)। আরব দেশে ক্ষেতের ফলন বেশী হলে ছেঁটে দেয়ার প্রচলন রয়েছে। কোরআন মজীদে রয়েছে ‘ইউজাক্বিহিম’ অর্থাৎ- মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর যাকাত দানের উপযুক্ত ব্যক্তির জমানো সম্পদের এক বৎসর পূর্ণহলে সম্পদের নির্ধারিত হক আদায় করা। যাকাত দিতে হয় সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে। সম্পদকে পবিত্র করণও যাকাত দানের উদ্দেশ্য। তাছাড়া যাকাত প্রদাতা যাকাত দানের মাধ্যমে পাপের অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন, যাকাত শব্দটির উৎপত্তি তায়কিয়া থেকে যার অর্থ মুশাহাদা বা সাক্ষ্য। যাকাত তার প্রদাতাকে পবিত্র করে থাকে এবং তার ইমানের বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দেয়। মোহাদ্দেছে দেহলভী (রহঃ) বলেন, যাকাতের আরেক নাম সাদকা। সাদকা শব্দটি এসেছে সিদকুন থেকে। সিদকুন অর্থ সততা। সাদকা বা যাকাত তাদের প্রদাতার ইমানের সততার দলিল। এই অর্থে যাকাতের নাম সাদকা। (সূত্র: মাদারেজুন নবুওয়াত, ওয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০১, শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী (রহঃ), সেরহিন্দ প্রকাশন)। ইসলামী সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কোরআনে বহুবার সালাতের সাথে যাকাতের উল্লেখ আছে। প্রায় ৩০টি জায়গায় যাকাতের কথা আছে। যার যাকাত আদায় হয়নি, তার সালাত কায়েম হয়নি। সাধারণত যাকাত বলতে আমরা যা বুঝি তা হল, রমজান মাসে সারা বৎসরের পুজির হিসাব করে তার শতকরা আড়াই ভাগ গরীব দুখীকে দান করা। পবিত্র কোরআনে যাকাত আদায়ের কথা বার বার উল্লেখ থাকলেও তার পরিমাণের কোন

উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়না। আবার আল কোরআনে যাকাত কাকে কাকে দিতে হবে, সে কথার উল্লেখ যেখানে আছে সেখানে ‘যাকাত’ শব্দটি নেই, আছে ‘সদকা’ শব্দটি।

এসব সদকা তো আসলে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য (ফকীর অর্থ যে নিজের জীবিকার জন্য অপরের সাহায্যের কাঙাল। আর মিসকীন অর্থ সেই সব লোক, যারা সাধারণ অভাবীদের তুলনায় আরও বেশি দুরবস্থায় রয়েছে)। এসব লোকদের জন্য, যারা সদকার কাজে নিযুক্ত, আর তাদের জন্য, যাদের মন জয় করা দরকার। (তা ছাড়া এসব) দাস মুক্ত করা, ঋণগ্রস্থদের সাহায্য করা, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের খিদমতে ব্যবহার করার জন্য। এটা আল্লাহর তরফ থেকে একটা ফরয। আর আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি পরম জ্ঞান বুদ্ধির মালিক। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা তাওবা, আয়াত: ৬০, শূরা: ১০)।

উক্ত আয়াতে বুঝা যায় আল্লাহপাক ‘সাদকা’ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু যাকাত সাদকা কিনা সে ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যায়। শতকরা আড়াই ভাগ যাকাতের ব্যবস্থা আসল কোথেকে? আড়াই ভাগ যাকাত দেওয়ার ব্যবস্থার সাথে পবিত্র কোরআনের যাকাত আদায়ের ভাবধারার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়না। পূর্ববর্তী নবী (আঃ) দের আমলেও যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পবিত্র কোরআনে তার পরিমাণেরও কোন উল্লেখ পাওয়া যায়না। তার একটি কারণ এও হতে পারে যে, যাকাত একটি চিরন্তন সার্বজনীন ও সর্বকালীন ব্যবস্থা যা সালাতের ন্যায় অবশ্যই আদায় করতে হবে, অন্যথায় মুমিন হওয়া যাবে না। যাকাত অনাদায়ে সকল ইবাদত পণ্ড্রম মাত্র।

পবিত্র কোরআনে যে যাকাতের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। ‘আতুজ যাকাতা’ শব্দটি দ্বারা শুধু টাকা- পয়সা, ধন- দৌলতের সম্পর্কের কথা বুঝানো হয়নি, প্রতিটি বিষয়বস্তুর যাকাত আছে। যেমন কর্মের যাকাত, চিন্তা- চেতনার যাকাত, দেহের যাকাত, ধন- দৌলতের যাকাত ইত্যাদি। যতগুলো বিষয়ের সাথে মানুষ দৈহিক এবং মানসিকভাবে জড়িত তার প্রত্যেকটির যাকাত আছে। হাদিস শরীফে সাওম ও রোযাকে যেমন দেহের যাকাত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ২.৫% (শতকরা আড়াই ভাগ) যাকাত প্রদানের নিয়ম অনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে

খোলাফায়ে রাশেদার আমলে। নবী করিম (সঃ) এর আমলে মুসলমানগণ তাদের প্রয়োজনের অধিক সম্পদ প্রিয়নবীজি (সাঃ) এর খেদমতে পেশ করতেন। অতঃপর প্রিয়নবীজি (সাঃ) সেখান থেকে অভাবীদের প্রয়োজন মোতাবেক দান করতেন। পবিত্র কোরআনের নির্দেশের সাথে এ ব্যবস্থা সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়।

যেমন পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে- “লোকে যখন আপনার নিকট জিজ্ঞেস করবে: কি পরিমাণ সম্পদ তারা দান করবে? আপনি বলে দিন যা কিছু অতিরিক্ত তাই। (আল কোরআন, সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৯, সূরা নং- ২)।

এভাবে দান করাটা পবিত্র কোরআনের ভাষায় অর্থ নৈতিক যাকাত বলে মনে হয়। পুঞ্জীভূত টাকা বা সম্পদের শতকরা আড়াইভাগ দিলেই আল্লাহর কাছ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে এ ধরনের কোন নির্দেশ, আভাস, ইঙ্গিত পবিত্র কোরআনের কোন খানেই দেওয়া হয়নি। যেহেতু পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে সম্পদ জমানো, পুঞ্জীভূত করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, সেহেতু জমানো টাকা বা সম্পদ হতে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দেওয়ার প্রশ্নই আসেনা। যেমন এরশাদ হচ্ছে-

যারা ধন- সম্পদ ভান্ডারে জমা রাখে এবং অপরকেও তা করতে উৎসাহ দেয় এবং আল্লাহ অনুগ্রহবশতঃ যা দান করেছেন তা গোপন রাখে, সে সব কাফেরদের জন্য গ্লানিকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। (সূরা নেসা, আয়াত: ৩৭)।

তোমাদের বলা হয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়কর অথচ তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা ধন সম্পদ ভান্ডারে জমা রাখে। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৩৮, সূরা নং- ৪৭)।

যারা ধন ভান্ডারে জমা রাখে এবং গণনা করে এবং মনে করে যে এ ধন তাদেরকে দীর্ঘস্থায়ী করবে, তাদেরকে হোতামা নামক দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা হুমাজাহ, আয়াত: ২- ৪, সূরা নং- ১০৪)।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (র)- এর উর্দু তরজমার বাংলা অনুবাদে অধ্যাপক গোলাম আযম তার ব্যাখ্যায় লিখেছেন। লোকেরা নিজেদের টাকা - পয়সার মালিক নিজেরাই ছিল। তারা জানতে চাইল, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কী পরিমাণ খরচ করব? জবাব দেওয়া হয়েছে, তোমাদের টাকা দ্বারা প্রথমে নিজেদের যা দরকার তা ব্যবস্থা কর। তারপর যা বাঁচে তা আল্লাহর পথে খরচ কর। এটা হচ্ছে নিজের ইচ্ছায় যা বান্দাহ তার মনিবের পথে খরচ করে। (সূত্র: আল কোরআনের অনুবাদ, সুরা বাকারা, আয়াত: ২১৯; ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭২, অনুচ্ছেদ: ৭৩)।

জনাব গোলাম আযমের এই ব্যাখ্যায় তাহারই একজন মিতা সৈয়দ গোলাম মোরশেদের কথায় বলা যায় যে, কারো কারো মতে নির্দিষ্ট হারে যাকাত প্রদান করে যে কোন পরিমাণ সম্পদ যে কোন ব্যক্তি জমা করতে পারবে। তারা তাদের মতের সমর্থনে শতকরা আড়াইভাগ যাকাত আদায়ের হাদিস ও পবিত্র কোরআনের উত্তরাধিকার আইনের আয়াতগুলোকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাদের মতে নির্দিষ্ট হারে যাকাত প্রদানের পর অতিরিক্ত সম্পদ থেকে অপরের জন্য ব্যয় করা বা না করা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। তাদের ধারণা গরীব দুঃখীরা দান বা খয়রাত হিসেবে ব্যক্তির অতিরিক্ত সম্পত্তি হতে সাহায্য পেতে পারে মাত্র- কিন্তু অধিকার হিসেবে দাবী করতে পারেনা। আল কোরআন নির্দেশিত জীবন দর্শনের সামগ্রিক পর্যবেক্ষণে তাদের এ যুক্তির অসারতা ধরা পড়ে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সীমিত সম্পদ রাখার অধিকারে ইসলামের মৌল স্বীকৃতি আছে বটে, কিন্তু এ স্বীকৃতি সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যক্তি তার নিজের অধিকারে রাখতে পারে তখনি, যখন সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির তাতে কোন মৌলিক প্রয়োজন থাকবেনা। তথা সমাজের অন্যান্য মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর পর কিছু সম্পদ ব্যক্তি নিজ এবং সমাজের প্রয়োজনে জমা করে রাখতে পারে সকলের আমানত স্বরূপ। প্রয়োজন হলে বা কোথাও অভাব দেখা দিলে তা নিঃসংকোচে দান করে দিতে হবে। এই জমা কৃত সম্পদের উপর যেমন তার উত্তরাধিকারীর অধিকার রয়েছে, তেমনি সমাজের গরীব- দুঃখী, এতিম- মিসকিন ও আত্মীয় স্বজনেরও হক বা অধিকার রয়েছে।

যেমন কোরআনে সূরা মাআরিজের ব্যাখ্যায় জনাব গোলাম আযম বলছেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের কল্যান পাওয়াকেই যারা জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়, তারা মানবীয় দুর্বলতার নিকট পরাজিত হয় না। ঈমানের বলে নাফসের উপর বিজয়ী হওয়ার যোগ্যতার দরুন তাদের মধ্যে উন্নত মানের চরিত্র সৃষ্টি হয়। এসব গুণের লোকেরাই বেহেশতে সম্মানের সাথে চিরদিন থাকবে। সে গুণগুলোর মধ্যে যার একটি হল: ‘তারা অভাবীদেরকে সাহায্য করা কর্তব্য মনে করে এবং তাদের মালে গরিবদের হক আছে বলে স্বীকার করে। (সূত্র: আল কোরআনসূরা মা’আরিজ, আয়াত: ২৪- ২৫, শুরা নং- ৭০)।

এই আয়াতের অধিকাংশই বাংলা তরজমার কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে যে, ‘নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে’। কিন্তু নির্দিষ্ট শব্দটি বলতে আমি শব্দার্থে আল কোরআনুল মজীদে কোন শব্দ খুঁজে পাইনি। সেখানে রয়েছে যেমন: ‘ওয়াল্লাযিনা’- এবং যারা, ‘ফী’- মধ্যে, ‘আমওয়ালিহিম’- তাদের সম্পদ সমূহের, ‘হাক্কুম’- অধিকার, ‘মাআলুম’- অবগত। তাহলে এখানে নির্দিষ্ট শব্দটি কোথায়? (সূত্র: শব্দার্থে আল কোরআনুল মজীদ, সূরা মাআরিজ, আয়াত: ২৪- ২৫, অনুবাদঃ মতিউর রহমান খান, আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৯)।

“ওয়া ফী আমওয়ালিহিম হাক্কুল লিস সাযিলী ওয়াল মাহরুম” অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যে মাল তাদের কাছে ছিল তা শুধু নিজেরাই ভোগ করত না; সমাজের বিশেষ করে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা অভাবী তাদের হকও ঐ মালের উপর ছিল বলে মনে করত এবং সে হক আদায় করত। (সূত্র: আল কোরআনের অনুবাদ, সূরা যারিয়াত, আয়াত: ১৯, শুরা নং- ৫১; অধ্যাপক গোলাম আযম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৭ এর ১৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)।

হক বা অধিকার কারো দয়া বা ইচ্ছার উপর নির্ভর করেনা। কারন হাদিস শরীফেও প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেন, ‘নিশ্চয় তোমাদের মালে মানুষের হক বা অধিকার রয়েছে যাকাত ছাড়াও। (সূত্র: তিরমিজি, ইবনে মাজা)।

চার প্রকার মালের উপর যাকাত ওয়াজিব করা হয়েছে। এই চার প্রকার মাল সহজে হিসাব করে যাকাত দেয়া সম্ভব। প্রথম প্রকার হচ্ছে ফসল ও ফল। যেমন খেজুর, আঙ্গুর, মোনাক্কা ইত্যাদি। তরি তরকারী সবজী - এসবের উপর যাকাত নেই। কেননা এসকল জিনিস অতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয় প্রকারের মাল হচ্ছে, গৃহপালিত পশু। যেমন উট, গরু, মহিষ, বকরি ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকারের মাল হচ্ছে সোনা রূপা। চতুর্থ প্রকারের মাল হচ্ছে বাণিজ্য সামগ্রী তা যে ধরনেরই হোক না কেনো। যেমন কাপড়, বাসন কোসন, বিছানা, আসবাবপত্র ইত্যাদি। এ সকল সম্পদ নেসাব পরিমাণ হলে এবং এক বৎসর জমা থাকলে বছরান্তে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। (সূত্র: মাদারেজুন্ নবুওয়াত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০২, শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী (রহ:), সেরহিন্দ প্রকাশন, ৮৯ যোগীনগর রোড, উয়ারী, ঢাকা- ১২০৩)।

আল্লামা হযরত শিবলী (রাঃ) একজন বড় অলি আল্লাহ ছিলেন। একদিন বাগদাদের বাদশা মুওয়াক্কীল বিল্লাহ হযরত শিবলীকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বলতো, বিশ দিরহামের যাকাত কত হবে? হযরত শিবলী উত্তর দিলেন, বিশ দিরহামের যাকাত হবে সাড়ে বিশ দিরহাম। এতে বাদশা আশ্চর্যান্বিত এবং রাগান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ কেমন কথা! এ শিক্ষা তুমি কোথায় পেলে? উত্তরে হযরত শিবলী বললেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে। তার নিকট চল্লিশ হাজার দিনার ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যাকাতের হুকুম করলে তিনি নিজের জন্য একটি দিনারও না রেখে সমুদয় অর্থ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন। বাদশা বললেন, আচ্ছা এতো সমান সমান হল, কিন্তু তুমি ঐ আধা দিনার অতিরিক্ত কোথায় পেলে? হযরত শিবলী (রাঃ) বললেন, ইহা আপনার উপর জরিমানা, বিশ দিরহাম আল্লাহর পথে খরচ না করে জমা রাখার জন্য। (সূত্র: শামসুল হক অনুদিত, তায়কারাতুল আউলিয়া, ২য় খণ্ড, আবুল হাসান নূরী বাগদাদী প্রসঙ্গ; গ্রন্থস্বত্ত: আহলে কোরআন, পৃষ্ঠা: ৯৯)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকটে যাকাতের মাল নিয়ে আসা হলে তিনি কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক যাকাত প্রদাতার জন্য দোয়া করতেন। কোরআন মজীদে এরশাদ করা হয়েছে, “আপনি তাদের



যাকাতের মাল গ্রহণ করে তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে দিন এবং তাদের জন্য দোয়া করুন।” এই আয়াতে সালাত শব্দটির মাধ্যমে দোয়া বুঝানো হয়েছে। (সূত্র: মাদারেজুন্ নবুওয়াত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৩, শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী (রহ:), সেরহিন্দ প্রকাশন, ৮৯ যোগীনগর রোড, উয়ারী, ঢাকা- ১২০৩)।

“যা (কিছু ধন সম্পদ) তোমরা সুদের ওপর দাও, (তা তো এ জন্যই দাও) যেন তা অন্য মানুষদের মালের সাথে (শামিল হয়ে) বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে তা (কিন্তু মোটেই) বাড়ে না, অপরদিকে যে যাকাত তোমরা দান করো তা (যেহেতু একান্তভাবে) আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে দান করো, তাই বরং বৃদ্ধি পায়, জেনে রেখো, এরাই হচ্ছে (সেসব লোক) যারা (যাকাতের মাধ্যমে) আল্লাহর দরবারে নিজেদের সম্পদ বহুগুণে বাড়িয়ে নেয়। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা রুম, আয়াত: ৩৯, সূরা নং- ৩০; আল কোরআন একাডেমী লন্ডন)।

## সুদ প্রসঙ্গে

আল্লাহ তায়ালা বলছেন: “হে মানুষ তোমরা যারা (ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান হিসেবে) বিশ্বাস করেছো, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না এবং তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো। আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩০, সূরা নং- ৩)।

যারা সুদ খায় তারা (মাথা উচু করে) দাঁড়াতে পারবে না, (দাঁড়ালেও) তার দাঁড়ানো হবে সে ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান নিজস্ব পরশ দিয়ে (দুনিয়ার লোভে লালসায়) মোঘাচ্ছন্ন করে রেখেছে; এটা এ কারণে, যেহেতু এরা বলে, ব্যবসা বাণিজ্য তো সুদের মতোই (একটা কারবারের নাম), অথচ আল্লাহ তায়ালা ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন, তাই তোমাদের যার (যার) কাছে তার মালিকের পক্ষ থেকে (সুদ সংক্রান্ত) এ উপদেশ পৌঁছেছে, সে অতপর সুদের কারবার থেকে বিরত থাকবে, আগে (এ আদেশ আসা পর্যন্ত) যে সুদ খেয়েছে তা তো তার জন্যে অতিবাহিত হয়েই গেছে, তার ব্যাপারে একান্ত ই আল্লাহ তায়ালা সিদ্ধান্তে র ওপর; কিন্তু (এরপর) যে ব্যক্তি (আবার সুদী কারবারে) ফিরে আসবে, তারা অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তায়ালা সুদ নিশ্চিহ্ন করেন, (অপর দিকে) দান সদকার পবিত্র কাজকে তিনি (উত্তরোত্তর) বৃদ্ধি করেন, আল্লাহ তায়ালা (তাঁর নেয়ামতের প্রতি) অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের কখনো পছন্দ করেন না। তবে যারা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ তায়ালা ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠা করেছে, যাকাত আদায় করেছে, তাদের ওপর কোনো ভয় থাকবে না, তারা সেদিন চিন্তিতও হবে না। হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা (সুদের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করো, আগের (সুদী কারবারের) যে সব বকেয়া আছে তোমরা তা ছেড়ে দাও, যদি সত্যিই তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনো। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা বাকারা, আয়াত: ২৭৫- ২৭৮, সূরা নং- ২, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন)।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন: যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে তোমরা আমা হইতে দূরে থাক। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা দূখান, আয়াত: ২১, পারা: ২৫, গুরা নং- ৪৪)।

## খুমস প্রসঙ্গে

ইসলামের সকল ফকিহবৃন্দ বিশ্বাস করেন যে, সমস্ত যুদ্ধলব্ধ গনিমত জিহাদকারীদের মধ্যে বন্টিত হয়, শুধুমাত্র এর এক পঞ্চমাংশ ব্যতীত যা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে খরচ করা হয়। খুমসের বিষয়ে শীয়া এবং সুন্নিদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। আমার জন্য ফরজ হচ্ছে যে, কোন সিদ্ধান্তে পৌছানোর আগেই খুমস সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাত করি। এই আলোচনা আমি কোরআন মজিদ থেকে শুরু করছি। আল্লাহ এরশাদ করেছেন: “এটা জেনে রেখো যে, যা কিছু তোমরা গনিমতের মাল অর্জন কর তার মধ্যকার এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহর ও তার রাসূলের, এবং রাসূলের (সাঃ) নিকট আত্মীয়দের, এতিমদের ও মিসকিনদের এবং মুসাফিরদের এবং ভ্রমণকারীদের জন্য” (সূত্র: আল কোরআন, সূরা আনফাল, আয়াত: ১, ৪১; সূরা বানী ইসরাইল, আয়াত: ২৫; সূরা রোম, আয়াত: ৩৮; সূরা আহযাব, আয়াত: ২৭; সূরা হাশর, আয়াত: ৬- ৯)।

শীয়া ফকিহদের সাথে অন্যান্য ফকীহদের পার্থক্য হলো এই যে, অন্যান্যরা খুমসকে শুধুমাত্র যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করেন এবং তা ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে এ ওয়াজিব আছে বলে মনে করেন না। আর এ ব্যাপারে তাদের দলিল হলো এই যে, এ আয়াতটি যুদ্ধলব্ধ গনিমতের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

কিন্তু ধারণা দু’টি কারণে সঠিক নয়ঃ প্রথমত আরবী ভাষায় যা কিছুই মানুষের হস্তগত হয় তাকেই গনিমত বলা হয় এবং শুধুমাত্র যুদ্ধলব্ধ গনিমতকেই বুঝায় না। যেমন ইবনে মানজুর বলেন, “গনিমত হলো আনায়াসে কিছু হস্ত গত হওয়া” (লিসানুল আরাব, ‘গনিমত’ শব্দ, ইবনে আসিরের আননেহয়াতে এ শব্দটির অর্থ ঠিক এর কাছাকাছি এবং ফিরুজাবাদীর কথাও তাই)।

তাছাড়া কোরআনও এ শব্দটিকে বেহেশতী নেয়ামতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে বলেছে: “ফা’ইন্দাল্লা- হি মাগ্বা- নিমু কাসীরাহ্” অর্থাৎ- মহান আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার। (সূরা আন- নিসা, আয়াত: ৯৪, সূরা নং: ৪)।

মূলত গনিমত কথাটি হলো গারামত বা খেসারতের বিপরীত শব্দ। যখন মানুষ কোনো কিছু লাভ করা ব্যতীত এক নির্দিষ্ট পরিমাণ জরিমানা দেয়ার জন্যে আদিষ্ট হয়, তাকে গারামাত বা খোসারাত বলে। যখন লাভবান হয় তাকে গনিমত বলে। অতএব, কেবল যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মধ্যেই এ আয়াত সীমাবদ্ধ করার কোনো দলিল নেই এবং বদরের যুদ্ধের সময় এ আয়াত নাযিল হওয়া সীমাবদ্ধকরণের দলিল নয়। আর সম্পদের এক পঞ্চমাংশ হিসাব করার বিধান একটি সামগ্রিক বিধান এবং এটি বিশেষ কোনো বিষয় নয় (অর্থাৎ শুধুমাত্র যুদ্ধলব্ধ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়)।

দ্বিতীয়ত কোনো রেওয়াজেতে এসেছে যে, মহানবী (সাঃ) এর সকল প্রকার সম্পদ থেকেই খুমস প্রদান করেছেন। অতঃপর আব্দুল কাইস গোত্রের লোক তাঁর (সাঃ) - এর নিকট এসে বলল, ‘আপনার ও আমাদের মধ্যে মুশরিকরা বাধা হয়ে আছে। আমরা শুধুমাত্র হারাম মাসগুলোতে (অর্থাৎ যখন নিরাপত্তা থাকে) আপনার নিকট আসতে সক্ষম। যে সকল বিষয়ের আমলের মাধ্যমে আমরা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারব এবং অন্যদেরকেও এগুলোর প্রতি আহ্বান করব এমন কিছু হুকুম আমাদের জন্যে বর্ণনা করুন। মহানবী (সাঃ) বলেন, তোমাদেরকে ঈমান রক্ষা করতে আদেশ দেবো। অতঃপর তিনি ঈমানের ব্যাখ্যা দিলেন, “আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদান, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং আয়ের এক পঞ্চমাংশ ব্যয় করা। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুয় মাগাযী, পৃষ্ঠা: ২৩৮, হাদীস: ৪০২৩, আধুনিক প্রকাশনী; সহীহ বোখারী, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা: ২৫০)।

নিঃসন্দেহে এ হাদীসে গনিমত বলতে যুদ্ধ বহির্ভূত আয়- উপার্জনের কথা বুঝানো হয়েছে। কারণ তারা বলেছিল এমন একস্থানে আমরা আছি যে, মহানবী (সাঃ) - এর ধারে কাছে নয়। অর্থাৎ মুশরিকদের ভয়ে মদীনায় আসতে পারি না। এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ যারা মুশরিকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, তারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ অবতীর্ণ হতে অপারগ ছিল। সেখানে যুদ্ধলব্ধ গনিমতের খুমস প্রদানের তো প্রশ্নই আসে না। (সূত্র: ইমামিয়া বিশ্বাসের সনদ, পৃষ্ঠা: ২৩৩,

একশ আটচল্লিশতম মূলনীতি, মূলঃ আয়াতুল্লাহ জা'ফর সুবহানী, অনুবাদ: মোহাম্মদ মাস্টিনউদ্দিন)।

আহলেবাইতের ইমামগণ (আঃ) থেকে বর্ণিত রেওয়াতের মাধ্যমে সকল প্রকার আয় থেকে খুমস দেয়ার ব্যাপারটি পরিস্কার হয়ে গেছে। ফলে এ ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। (সূত্র: ওয়াসয়েলুশ শিয়া, খণ্ড ৬, কিতাবে খোমস, বাবে আউয়্যাল; ইমামিয়া বিশ্বাসের সনদ (ইসনা আশারী শিয়াদের বিশ্বাসের দলিল ভিত্তিক ব্যাখ্যা), পৃষ্ঠা: ২৩৩, মূলনীতি নং- ১৪৮)।

শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত প্রদানের কথা পবিত্র কোরআনে নেই। কিন্তু শতকরা বিশভাগ খুমস প্রদানের নির্দেশ পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে বলা হচ্ছে, “এসব গরীব ও নিঃস্ব দের জন্য এবং (ব্যবস্থাপনায় কর্মরত) কর্মচারীদের জন্যে, যাদের অন্তকরণ (দ্বিনের প্রতি) অনুরাগী করা প্রয়োজন তাদের জন্যে এবং তা নির্ধারিত”। সূরা আনফালের (খুমসের) আয়াতে আমরা সে নির্ধারিত অংশটির উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি যা যাবতীয় এক পঞ্চমাংশ)।

জনাব গোলাম মোরশেদের ভাষায় বলতে গেলে, হাদীস মোতাবেক যদি ২.৫% (শতকরা আড়াই টাকা) যাকাত হয় তাহলে কোরআন মোতাবেক ২০% খুমস হয়। তাহলেও তো ২২.৫% (শতকরা সাড়ে বাইশ টাকা) যাকাত বা সাদকা দিতে হয়। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রবিদরা ‘গনিমত’ এর দোহাই দিয়ে সে ২০% প্রদেয় নির্দেশটি রদ বা বাতিল করে দিয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশকে ‘মুজতাহিদরা’ বাতিল করে দেন, কি সাংঘাতিক কথা! বলা হয়ে থাকে, যেহেতু এখন যুদ্ধও নেই গনিমতও নেই, সে কারনে নাকি এ নির্দেশ স্বাভাবিকভাবে রহিত হয়ে গেছে? (অথচ স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংগালী মা বোনদের গনিমতের মাল মনে করা হয়েছিল)। তাহলে পবিত্র কোরআনের আয়াত শাস্ত ও সর্বকালিন হয় কিভাবে? অর্থে ‘গনিমত’ শব্দটি আল্লাহপাক এখানে ব্যবহার করেছেন তা কি আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবেনা? ‘গনিমত’ শব্দ ব্যবহার হওয়াতে যদি উক্ত আয়াতের নির্দেশটি রহিত হয়ে যায়, তাহলে সে প্রদেয় অর্থের যারা হকদার

তথা আল্লাহ, রাসূল (সাঃ) , আওলাদে রাসূল (সাঃ) , এতিম, মিছকীন ও মুসাফিররা তো আর দুনিয়া থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়নি? তাহলে যুদ্ধ বন্ধ হবার কারণে এবং গনিমত হস্তগত না হওয়ার কারণে তাঁরাইবা কেন তাঁদের হক বা অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন? এতে আল্লাহপাক নিজেও রয়েছেন। আল্লাহ কিছুদিনের জন্য তাঁদের অভাব বা প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে ঐ নির্দেশ জারী করলেন, অতঃপর যুদ্ধ বন্ধ হবার কারণে তাঁদের অভাব, প্রয়োজনের কথা ভুলে গেলেন এবং এ আয়াতের নির্দেশ রহিত করে তাদের বঞ্চিত করলেন? আওলাদে রাসূল (সাঃ) , এতিম, মিসকিন ও মুসাফিররা তখন গনিমতের মাল পাওয়াতে খাবার খেতেন, গনিমত বন্ধ হওয়ায় এখন কি তারা বাতাস খাবেন? এ কেমন কথা? আল্লাহ কি আমাদের মত এতই দোদুল্যমান ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেন? (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ আওলাদে রাসূল (সাঃ) , এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের বা অভাবগ্রস্থদের অধিকার জলাঞ্জলি দেবেন, এ কথা ভাবতেও তো অবাক লাগে! আসলে আমাদের তথাকথিত ‘মুজতাহিদরা’ একটুও চিন্তা করে দেখেননি যে, আল্লাহতলা এখানে ‘গনিমত’ শব্দটি কেন ব্যবহার করেছেন? গনিমত শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য হল, শুধুমাত্র যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ সম্পদই গনিমত নয় বরং আল্লাহর অনুগ্রহে প্রাপ্ত প্রবৃদ্ধি তথা আল্লাহ অনুগ্রহবশতঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সমস্ত সম্পদ দান করেন তার সমুদয়ই গনিমতের অন্তর্ভুক্ত। গনিমত শব্দের এ রকম ব্যাখ্যা হওয়াই সমুচিত। হিয়রতের পর থেকে মক্কা বিজয়ের পর পর্যন্ত মুসলমানরা সারা বৎসর জেহাদে লিপ্ত থাকতেন। জেহাদে প্রাপ্ত গনিমতের সম্পদই ছিল তাঁদের আয়ের একমাত্র উৎস। কাফেরদের আক্রমণের ভয়ে তাঁরা মদিনার বাইরে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যে যেতে পারতেন না। মুহাজিররা তাঁদের সম্পদ মক্কায়ে ফেলে এসে মদিনায় নিঃস্ব অবস্থায় জীবন যাপন করতেন। জেহাদের তাড়নায় সারা বৎসরই তাঁরা উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকতেন, ফলে কৃষিকার্য বা আয়ের অন্যকোন প্রচেষ্টা তারা করতে পারতেন না। সে ক্ষেত্রে যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মালেই ছিল তাদের আয়ের একমাত্র উৎস। সে কারণেই আল্লাহপাক এখানে ‘গনিমাতুন মিন শাইয়িন’ অর্থাৎ ‘গনিমতের যাবতীয় কিছু’ বাক্যটি সমুদয় আয় অর্থেই ব্যবহার করেছেন।

শীয়ারা সব ধরনের লভ্যাংশকে মালে গনিমত মনে করে থাকেন এবং আহলে বায়েতের ইমামদের আনুগত্য সাপেক্ষে বৎসর শেষে খরচাদির পর যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকে তার খুমস বাহির করে থাকেন। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এটার প্রতি ইজমা আছে যে খুমস কেবল ঐ সম্পদের উপর ওয়াজিব হবে যেটা যুদ্ধের মারফৎ মুসলমানদের হাতে আসবে।

জনাব ড. মুহাম্মদ তিজানী আল সামাভীর ভাষায় বলতে হয় যে, ‘আমি অন্যান্য সন্ধানীদের ন্যায় আল্লাহর গ্রন্থ এবং রাসূল (সাঃ) হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নিজের মন মর্জি মোতাবেক করবো না। আর না নিজের মাযহাবের পক্ষ অবলম্বন করে সেগুলির অর্থ করবো। কিন্তু আহলে সুন্নাতের কথা ও মন্তব্যকে আমি কোন খাতায় ফেলবো? তারা তাদের সিহাহসমূহ এক দিকে তো খুমস কে এক বাক্যে ওয়াজিব বলেছেন; আবার নিজেদের ব্যাখ্যা ও মাযহাবগত শত্রুতার কারণে সেটার উপর আমল করেন না। এখানে এই প্রশ্নটি উত্তর বিহীন থেকে যায় যে, সেটাকে কার্যকারী কেন করেন না? অতএব, নির্দিধায় মুখ ফুটে বেরিয়ে আসে যে, যেটা করতে পারেন না সেটা বলেনই বা কেন? এধরনের অনেক কথা তাদের সিহাহ ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহে পেয়ে যাবেন যেগুলির উপর শীয়ারা আমল করে থাকেন। কিন্তু তারা (আহলে সুন্নাত ও অন্যান্য মাযহাবের লোকসকল) নিজেরা আমল করেন না। ঐ সমস্ত কথিত বিষয়সমূহের মধ্যে খুমসও একটি বিষয়’।

ইমাম আবু হানিফার মতে ‘রিকায়’ অর্থাৎ ভূ-গর্ভে প্রোথিত সম্পদ, আর মা’দান অর্থাৎ ভূ-গর্ভে প্রকৃতি-দত্ত (খনি) এ উভয়টার মধ্য এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, পৃষ্ঠা: ৫৮, হাদীস: ১৪০১, টিকা নং: ১৬, আধুনিক প্রকাশনী, সন- সেপ্টেম্বর ১৯৮৬)।

সহীহ আল বুখারীতে ‘রেকায়’ সম্পর্কে একটা অধ্যায় নির্ধারণ করেছেন। আর ইবনে মালিক আনাস ও ইবনে ইদরিস (ইমাম শাফেয়ী) বলেন, জাহেলী যুগের ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদকে ‘রিকায়’ বলে। এর পরিমাণ কম হোক আর বেশী হোক তাতে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। কিন্তু মা’দান (জমির উপর ভাগের সম্পদ) এর উপর খুমস এজন্যে ওয়াজিব যেহেতু এটা খনিজ



নয়। রাসূল (সাঃ) বলেছেন: মা'দান হচ্ছে বিতরণ যোগ্য আর খনিজ এর উপর ভূগর্ভস্থ ধনে এক পঞ্চমাংশ খুমস দিতে হবে'। ইমাম আবু হানিফা বলেন, জাহেলী যুগের ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদের ন্যায় খনিও 'রিকায়'। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, পৃষ্ঠা: ৫৮, হাদীস: ১৪০১, আধুনিক প্রকাশনী, সন- সেপ্টেম্বর ১৯৮৬)।

কিন্তু ইমাম বুখারী বলেন, নবী (সাঃ) ভূ- গর্ভস্থ ধনে এক পঞ্চমাংশ নির্ধারণ করেছেন, পানি অর্থাৎ সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত ধনে নয়। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, পৃষ্ঠা: ৫৮, হাদীস: ১৪০১, আধুনিক প্রকাশনী)।

আর বুখারী তার সেই সহীতেই বলেছেন যে: 'হাসান বসরী বলেন, আম্বর ও মুক্তার মধ্যে এক পঞ্চমাংশ দেয়া ওয়াজিব'। 'ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন আম্বর ভূগর্ভস্থ ধন নয়, বরঞ্চ এটা সমুদ্র থেকে উথিত একটি বস্তু। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, পৃষ্ঠা: ৫৮, হাদীস: ১৪০১, টিকা নং: ১৫, আধুনিক প্রকাশনী, সন- সেপ্টেম্বর ১৯৮৬)।

এখানে ইমাম বুখারী যে বলেছেন 'পানি থেকে প্রাপ্ত ধনে নয়' এটা কোন সাহাবার রেওয়ায়েত? অথবা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর কোন ঘনিষ্ঠ সাহাবী থেকে বর্ণিত যে এটা গ্রহণ যোগ্য হবে? ইবনে আব্বাস? কিন্তু ইবনে আব্বাস তো এখানে সমুদ্র ও ভূগর্ভস্থ ধনের মধ্যে একটি পার্থক্য দেখিয়েছেন তিনি তো স্পষ্ট বারণ করেননি। কেননা নবী (সাঃ) রিকায়ের (সংগ্রহের) উপর খুমস ওয়াজিব করেছেন, সেটা পানির তল দেশে থাকাটা জরুরি নয়।

সত্য সন্ধ্যানীগণ উক্ত হাদীস সমূহ দ্বারা অনুমান করে নিতে পারেন যে, মালে গনিমতের উপর আল্লাহ খুমস ওয়াজিব করেছেন, এর অর্থ শুধু ঐ ধন সম্পদ যা মাটির তলা থেকে বাহির করা হয়ে থাকে। আর যে বাহির করে সম্পদ তারই হয়। সুতরাং গনিমত হিসাবে তার খুমস ওয়াজিব হবে। অনুরূপ সমুদ্রহতে যে মনি মুক্তা উদ্ধার করা হয়ে থাকে তার জন্যেও খুমস ওয়াজিব। কেননা সে গুলিও হচ্ছে গনিমত। বুখারীর হাদীসসমূহ দ্বারা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে এসকল বড় বড় জামাত ও অনুসরণকারীদের কথা আর আমল হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী। এবং দুটোতেই অসামঞ্জস্যতা পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় পাঠকমন্ডলী, এখন লক্ষ্য করুন তাদের এই ভুল

ও ভ্রান্ত দলিল উম্মাতকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিচ্ছে। যখন বুখারীর মত শ্রেষ্ঠ হাদীস বেত্তা খুমসের পক্ষপাতি। সুতরাং শীযাদের কথা এখানেও বাস্তবতাপূর্ণ। খুমস সম্পর্কে তারা যে কথা বলেন সে মতে আমলও করেন এবং তাদের কথা ও কাজ পুরা পুরি মিল আছে। (সূত্র: আমিও সত্যবাদীদের সঙ্গে হয়ে গেলাম, পৃষ্ঠা: ১৮৯, মূল: জনাব ড. মুহাম্মদ তিজানী আল সামাভী)।

তাছাড়া আমরা ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করলেও খুমস প্রসঙ্গে স্পষ্ট প্রমাণ পাই যেমন: ‘গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদির এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইত। রাষ্ট্রের জন্য রক্ষিত অংশকে (এক-পঞ্চমাংশ) খুমস বলা হইত। হযরত ওমরের (রাঃ) সময় ইহা আয়ের একটি বড় উৎস ছিল। কোষাগারের অংশটি নবী করীম (দঃ)-এর আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সাজ-সরঞ্জামের জন্য ব্যয় করা হইত। (সূত্র: ইসলামের ইতিহাস, স্নাতক ও সম্মান শ্রেণীর জন্য, অধ্যাপক কে.আলী, এম.এ; পৃষ্ঠা: (১৫২) ১৮১; আলী পাবলিকেশনস; ৭৭, পাটুয়াটুলী, ঢাকা- ১, সন- ১৯৮৫)।

সাতটি জিনিসের উপর খুমস দেওয়া ওয়াজিব। সেগুলো হলো এইঃ (১) যে গনিমত যুদ্ধের পর কাফেরদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। (২) খনিজদ্রব্য। (৩) গুপ্তধন। (৪) ডুব দিয়ে সমুদ্রতল থেকে হাসিল করা মণি মুক্তা। (৫) হালাল মাল যেটা হারামের সাথে মিশে যায়। (৬) যে জমিন কাফের জিম্মি মুসলমানের কাছ থেকে খরিদ করেছে। (৭) কাজ কারবার, ব্যবসায় বাণিজ্যে, চাম্বাবাদ বরং যে কোন উপায়ে অর্জিত মুনাফা বা লভ্যাংশের। যদিও মুনাফা থেকে কামাই না হয়। (সূত্র: মুখতাছারুল আহকাম, পৃষ্ঠা: ৯৬, লেখক: ফকীহে আহলে বাইত হযরত আয়াতুল্লাহ আল-ওযমা আকায়ে আলহাজ্জ সাইয়েদ মুহাম্মদ রেজা আল মুসাভী গুলপাইগানী মাদ্দা যিল্লাহুল আ’লী)।

কোন লোক যখন বৎসরের মাঝামাঝি স্থায়ী কারবারের লভ্যাংশ থেকে নিজের ও পরিবার-পরিজনের জন্য খোরাক, পোশাক, ঘরের আসবাবপত্র, থাকার জন্য বাড়ী, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ, মেহমানদের অতিথেয়তা, দান-খয়রাত এবং অন্যান্য এ

জাতীয় খরচাদি কিংবা তার উপর যেসব হক অধিকার বর্তিয়েছে যেমন- মান্নত, কাফফারা ইত্যাদি আদায়ে অথবা বিয়ে- শাদী, মেয়ের জন্য দেয় উপটোকন এবং চিকিৎসা ইত্যাদির খরচ ও ব্যয়ভার তার সম্মান ও মর্যাদা অনুযায়ী হয়েছে তখন সেটাকে তার বৎসরের খরচের অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে। আর এগুলোর উপর খুমস নেই। (সূত্র: মুখতাছারুল আহকাম, পৃষ্ঠা: ৯৮, মাসআলা: ৩৭৫)।

যে সব খরচ কাজ কারবারের এবং মুনাফা হাসিলের পিছনে আবশ্যিক। যেমন- দোকানের ভাড়া, শিক্ষানবিশের মজুরী, কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদিও বৎসরের খরচাদির মধ্যে পরিগণিত। এগুলোর উপরও খুমস নেই। (সূত্র: মুখতাছারুল আহকাম, পৃষ্ঠা: ৯৯, মাসআলা: ৩৭৬)।

যে টাকা ঋণ নেয়া হয় তাতে খুমস নেই। দান ও উপহারে কোন খুমস নেই। যদিও এহতিয়াত হলো বাৎসরিক খরচের অতিরিক্ত হলে সেটার খুমস প্রদান করা। (সূত্র: আজ্জেবাতুল ইস্তিফতাত, পৃষ্ঠা: ২৫১, ওলীয়ে আমরে মুসলিমীনে জাহান হযরত আয়াতুল্লাহ আল- উযমা সাইয়েদ আলী খামেনেয়ী (মুদ্দা যিল্লুল অলী)- এর ফতোয়া সংকলন)।

নিকট আত্মীয় এবং পরিবার- পরিজনের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ‘খুমস’ কেবলমাত্র বনী হাশেম এবং বনী মোত্তালিবকে দান করিতেন। বনী নওফেল এবং বনী আবদুশ শামস তাঁহার গোত্র হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁহারা বার বার দাবী উত্থাপন করার পরও তিনি তাঁহাদিগকে খুমস এর অংশ দিতেন না। (সূত্র: আল ফারুক, মূল: আল্লামা শিবলী নোমানী, পৃষ্ঠা: ৩৫৪)।

(১) খুমস কাকে বলে? মালের পঞ্চম ভাগকে খুমস বলে। (২) খুমস কার উপর ওয়াজিব? প্রতি মুসলমানের উপর। (৩) খুমস কখন ওয়াজিব? সারা বৎসর আয়- ব্যয়ের পর অবশিষ্ট মালে। (৪) খুমস কাকে দিতে হয়? খুমস দুই ভাগ করা হয়, এক ভাগ গরীব সৈয়দকে ও অপর ভাগ ইমাম (আঃ) কে দিতে হয়। (৫) ইমামের অংশ কাকে দেওয়া হয়? ইমামের নায়েব মুযতাহিদকে। (৬) ইমামের নায়েব কি করবেন? ধর্ম ও মাযহাবের সকল কার্য সম্পন্ন করবেন। ধর্মীয় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও মাযহাবকে রক্ষা করবেন। (৭) যদি কোন ব্যক্তি খুমস না দেয়, তাহলে কি হবে? তাকে ইমামের হক (প্রাপ্য) লুণ্ঠনকারী বলা হয় ও সে ইমামের প্রকৃত বন্ধু হতে

পারে না। (৮) যার খুমস জানা নেই সে কি করবে? যখন জানতে পারবে তখন মুযতাহিদকে জিজ্ঞাসাকরে খুমস দিতে হবে যাতে খোদা ক্ষমা করে। (সূত্র: এমামীয়া দীনিয়াত, ১ম খণ্ড (এমামীয়া মাকাতিবের ধারাবাহিক পাঠ্যক্রম), পাবলিশার: তানজীমুল মাকাতিব, বিজনওর জেলা, লাখনৌও- ৩, ডাক ঠিকানা: ৩৯, জওহরি মহল্লা, লাখনৌও, ইউ, পি)।

## লাইলাতুল কদর (শবে কদর) প্রসঙ্গে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম “ইন্না আনযালনাহু ফী লায়লাতিল কাদরি। ওয়া মা আদরাকা মা লায়লাতুল কাদর। লায়লাতুল কাদরি খায়রুম মিন আলফি শাহর। তানাযযালুল মালাইকাতু ওয়াররুহু ফীহা বিইযনি রাব্বিহিম মিন কুল্লি আমর; সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফাজর।- অর্থাৎঃ নিশ্চয় আমি একে (কোরআন) কদরের রাত্রিতে নাযিল করেছি। আপনি কি জানেন কদরের রাত্রি কি? কদরের রাত্রি হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই রাত্রে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে ফেরেশতাগণ ও রুহ (জিবরাঈল) প্রত্যেক মঙ্গলজনক কাজ নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। এই মঙ্গলজনক কাজ ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।” (সূত্র: আল কোরআন, সূরা আল কদর, আয়াত: ১- ৫)।

রমজান মোবারকে শবে কদর নামে একটি রাত্রি আছে, যাহা কালামে পাকের ভাষায় সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। সহস্র মাস তিরাসী বৎসর চার মাসে হয়। এইরাত্রে এর এবাদত যাহার ভাগ্যে জুটিয়াছে সে বড় ভাগ্যবান। সে যেমন নাকি তিরাসী বৎসর চার মাসেরও অধিক কাল এবাদতে কাটাইল। (সূত্র: ফাজায়েলে আ’মাল, (অধ্যায়: ফাজায়েলে রমজান), দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা: ৪৬; তাবলীগী কুতুবখানা, ৬০ চক সার্কুলার রোড, চকবাজার, ঢাকা- ১২১১)।

হজরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুর পাক (সাঃ) বলেন, শবে কদর একমাত্র আমার উম্মতকেই দেওয়া হয়েছে। অন্য কাহাকেও নহে। উক্ত সেয়ামতের বারণ স্বরূপ হাদীস বর্ণিত আছে যে, পূর্ববর্তী উম্মতগন দীর্ঘায়ু হওয়ার কারণে অনেক বেশী বেশী এবাদত সক্ষম হইতেন। আর হুজুরের উম্মত স্বল্পায়ু হওয়ার দারুন উহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে। ইহাতে হুজুর (সাঃ) মনক্ষুন্ন হইলেন, কাজেই আল্লাহ পাক দয়াপূর্বক এই রাত্র দান করিলেন। যদি কোন ভাগ্যবান এইরূপ দশটি রাত্রও লাভ করেন এবং এবাদতে কাটান তবে আটশত তেত্রিশ বৎসর চারি মাসেরও বেশী সময় এবাদতের সওয়াব প্রাপ্ত হইবেন। (সূত্র: মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ১ম খণ্ড,

রেওয়াজত - ৭৭৫; ফাজায়েলে আ'মাল, (অধ্যায়: ফাজায়েলে রমজান), দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা: ৪৬; তাবলীগী কুতবু খানা, ৬০ চক সার্কুলার রোড, চকবাজার, ঢাকা- ১২১১)।

প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি আল্লাহর অপূর্ব নেয়ামত। উহাতে আমল করা আল্লাহর তওফীকেই সম্ভব। কত বড় সৌভাগ্যের অধিকারী ঐসব আওলিয়ায়ে কেলাম, যাহারা সারা জীবন শবে কদর প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন রাতে উহা সংঘটিত হয় ঐ সম্পর্কে হাদীস ও দলীল বর্ণিত আছে। উহার ফজীলত সম্পর্কে পবিত্র কালামে পাকে সূরায় ইন্না আনযালনা অবতীর্ণ হইয়াছে।

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের নিয়তে রমযানের রোযা রাখল, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের নিয়তে কদরের রাত্রিতে (ইবাদতে) দাঁড়াল, তার আগেরকার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুয সাওম, পৃষ্ঠা: ২৬১, হাদীস: ১৮৭১, আধুনিক প্রকাশনী, সন- ১৯৮৬; ফাজায়েলে আ'মাল, পৃষ্ঠা: ৪৯)।

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাত্রিতে তালাশ কর। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুয সাওম, পৃষ্ঠা: ২৬২, হাদীস: ১৮৭৪, ১৮৭৬, ১৮৭৭ আধুনিক প্রকাশনী, সন- সেপ্টেম্বর ১৯৮৬)।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ) বলেছেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ দিনে খোঁজ কর। লাইলাতুল কদর এসব রাত্রিতে আছে- যখন (রমযানের) ৯, ৭ কিংবা ৫ রাত বাকী থেকে যায় (অর্থাৎ ২১, ২৩ ও ২৫ তারিখে)। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুয সাওম, পৃষ্ঠা: ২৬৩, হাদীস: ১৮৭৮, আধুনিক প্রকাশনী, সন- সেপ্টেম্বর ১৯৮৬)।

ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তা (শবে কদর) শেষ দশদিনে আছে। যখন নয় রাত অতীত হয়ে যায় কিংবা সাত রাত বাকী থাকে। (সূত্র: সহীহ আল

বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুয সাওম, পৃষ্ঠা: ২৬৩, হাদীস: ১৮৮০, আধুনিক প্রকাশনী, সন- সেপ্টেম্বর ১৯৮৬)।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযানের শেষ দশদিনে ই'তেকাফে বসতেন। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুয সাওম, পৃষ্ঠা: ২৬৪, হাদীস: ১৮৮৩, আধুনিক প্রকাশনী, সন - ১৯৮৬)।

আল- কানাবী (র) আবু সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাধারণত রমযানের মধ্যম দশ দিনে ইতিকাকফ করতেন। এরূপে তিনি (সাঃ) এক বছর ইতিকাকফ করবার সময় রমযানের ২১শে রাতে, অর্থাৎ যে রাতে তিনি ইতিকাকফ শেষ করেন সেদিন তিনি (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি আমার সাথে ইতিকাকফে শরীক হয়েছে সে যেন রমযানের শেষ দশ দিন ও ইতিকাকফ করে এবং আমি লায়লাতুল- কদর দেখেছি, কিন্তু তা আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি নিজেকে শবে কদরের সকালে কাদামাটির মধ্যে সিজদা করতে দেখেছি। তোমরা তা (শবে কদর) রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে অশ্বেষণ করবে। (সূত্র: আবুদাউদ শরীফ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৮, হাদীস: ১৩৮২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

রাবী আবু সাঈদ (র) বলেনঃ উক্ত একুশের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল এবং তখন মসজিদের ছাদ খেজুর পাতার থাকায় পানি পড়েছিল। রাবী আবু সাঈদ (রা) আরো বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)- এর চেহারা মোবারকে, নাক ও চোখে ২১ তারিখের সকালে কাদামাটির চিহ্ন দেখতে পাই। (সূত্র: বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা; আবু দাউদ শরীফ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৮, হাদীস: ১৩৮২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়স জুহানী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)- এর খিদমতে আরজ করিলেনঃ আমি এমন এক ব্যক্তি যাহার বাড়ি অনেক দূরে অবস্থিত, তাই আমাকে আপনি একটি রাত বলিয়া দিন যেই রাত্রিতে আমি (ইবাদতের জন্য এই মসজিদে) আগমন করিব। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁহাকে বলিলেনঃ তুমি রমযানের তেইশে রাত্রিতে আগমন কর। (সূত্র: মুয়াত্তা ইমাম

মালিক (র), প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬০, রেওয়াজত - ৭৭২, তৃতীয় সংস্করণ: মার্চ ১৯৯৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

আবু সালামা (রা:) বলেছেন, আমি আবু সঈদকে- যিনি আমার বন্ধু ছিলেন- এক প্রশ্ন করলাম। তিনি জবাব দিলেন, আমরা নবী (সাঃ) - এর সঙ্গে রমযানের দশ দিনে ইতেকাফে বসলাম। অতঃপর বিশ তারিখের ভোরে নবী (সাঃ) বেরিয়ে আসলেন, আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আমাকে শবে কদর দেখান হয়েছে। তারপর আমি তা ভুলে গিয়েছি। কিংবা তিনি বলেছেন, আমাকে ভুলিয়া দেয়া হয়েছে। অতএব, তোমরা (রমযানের) শেষ দশদিনের বেজোড় ও অযুগ্ম তারিখে (অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯) লাইলাতুল কদর তালাশ কর, কেননা আমি দেখতে পেয়েছি যে, আমি স্বয়ং পানি ও কাদায় সিজদা করছি। এ জন্য যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর সাথে ইতেকাফে বসেছে সে যেন ফিরে চলে যায়। সুতরাং আমরা ফিরে চলে গেলাম। আমরা আকাশে একখণ্ড মেঘও দেখলাম না। হঠাৎ একখণ্ড মেঘ দেখা দিল এবং বর্ষণ শুরু হল। এমনকি মসজিদের ছাদ ভেসে গেল। এ ছাদ খেজুরের ডালে নিমিত ছিল। অতঃপর নামায পড়া হল। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - কে পানি ও কাদায় সিজদা করতে দেখলাম। এমনকি আমি তাঁর কপালে কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুয সাওম, পৃষ্ঠা: ২৬২, হাদীস: ১৮৭৩, আধুনিক প্রকাশনী, সন - ১৯৮৬)।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাহে রমযানের মধ্যের দশদিনে ইতেকাফে বসতেন। যখন বিশ তারিখ অতীত হত এবং ২১ তারিখ এসে যেত তখন তিনি - গৃহে ফিরে আসতেন। আর যারা তার সাথে ইতেকাফে বসতো তারাও ফিরে যেতো। একবার রমযানে তিনি সেই রাতে ইতেকাফে ছিলেন যে রাতে সাধারণত: তিনি ফিরে চলে যেতেন। তারপর তিনি মানুষের সামনে ভাষণ দান করলেন এবং আল্লাহ যা চেয়েছেন সে মতে তিনি নির্দেশ দিলেন। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুয সাওম, পৃষ্ঠা: ২৬৩, হাদীস: ১৮৭৫, আধুনিক প্রকাশনী, সন - ১৯৮৬)।



আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত: যখন একুশ তারিখের রাত আসল এটি ওই রাত ছিল যে রাতে কদরের রাত দেখানো হয়েছে। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুয সাওম, পৃষ্ঠা: ২৬৩, হাদীস: ১৮৮৫, আধুনিক প্রকাশনী, সন - ১৯৮৬)।

এখানে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে আমরা যতগুলো হাদীস পেয়েছি প্রায় প্রত্যেকটিতেই দেখা যাচ্ছে যে লাইলাতুল কদরকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তালাশ করতে বলেছিলেন শেষের দশ দিনের বেজোড় রাতে। ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত : লাইলাতুল কদর তোমরা পাবে ৯, ৭ কিংবা ৫ রাত বাকী থাকতে (অর্থাৎ ২১, ২৩ ও ২৫ তারিখে)। রাবী আবু সাঈদ (র) বলেনঃ উক্ত একুশের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল এবং তখন মসজিদের ছাদ খেজুর পাতার থাকায় পানি পড়েছিল। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর চেহারা মোবারকে, নাক ও চোখে ২১ তারিখের সকালে কাঁদামাটির চিহ্ন দেখতে পাই। রাসূলে খোদা (সাঃ) নিজেই বলেছেন ‘আমি লায়লাতুল- কদর দেখেছি, আমি নিজেকে শবে কদরের সকালে কাদামাটির মধ্যে সিজদা করতে দেখেছি। এখানে অধিকাংশতেই ২১- এর রাতকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে ৯ রাত বাকী থাকতে কদরের রাত হয় অর্থাৎ হয়ত ২১- এর রাত্রে অথবা ৭ রাত বাকী থাকতে অর্থাৎ ২৩- এর রাতে। আবার আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়স জুহানী (রা)- কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্পষ্ট উল্লেখ করে বলেই দিয়েছেন যে, ২৩ - এর রাতে। তাই শবে কদরকে ২৩- এর রাতেই উদযাপন করা উচিত।

মানুষের ঝগড়া- বিবাদের কারণে লাইলাতুল কদরের পরিচিতি বিলীন হল। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুয সাওম, পৃষ্ঠা: ২৬৩, হাদীস: নিচের অনুচ্ছেদ, আধুনিক প্রকাশনী, সন - ১৯৮৬)।

উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সাঃ) (একদা) আমাদেরকে লাইলাতুল কদর (এর সঠিক তারিখ) সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য বেরিয়ে এসেছিলেন। এমনি সময় দুজন মুসলমান বিবাদ করতে লাগল। তখন তিনি বললেন আমি বের হয়েছিলাম। তোমাদেরকে লাইলাতুল কদর (এর সঠিক তারিখ সম্বন্ধে) খবর দেওয়ার জন্য। কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি ঝগড়ায় লিপ্ত হল। (তাই এর এলম আমার থেকে) উঠিয়ে নেয়া হল। সম্ভবত: এর মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত

ছিল। অতএব, তোমরা লাইলাতুল কদরকে শেষের দশ দিনে, নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাত্রিতে তালাশ কর। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুয সাওম, পৃষ্ঠা: ২৬৩, হাদীস: ১৮৮৫, আধুনিক প্রকাশনী, সন - ১৯৮৬)।

উপরে উল্লেখিত সকল হাদীসে যদিও শবে কদরের রাত স্পষ্ট আকারে উল্লেখ রয়েছে। এবং সেটা এমন একটি দিন ছিল যে রাতে রাসূল এতই ইবাদত করেছেন এমনকি প্রচুর বর্ষের ফলেও তিনি ইবাদত ছাড়েননি পানি ও কাদায় সিজদা করলেন আর এটা ছিল ২১-এর রাত। কিন্তু একটি অদ্ভুত বাক্য এখানে দেখতে পাওয়া যায় যেমন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সবাইকে শবে কদরের প্রকাশ্য ঘোষণা দেওয়ার পরও নাকি বলেছেন: ‘তারপর আমি তা ভুলে গিয়েছি’। (হয়ত কোন ঝগড়াটে দুইজন ব্যক্তির জন্য)। কিংবা তিনি বলেছেন, আমাকে ভুলিয়া দেয়া হয়েছে। (এটা আবার কার জন্যে?)। তোমরা শবে কদরকে আবার তালাশ কর? এখানেকি লুকুচুরি খেলা হচ্ছিল যে আবার তালাশ করতে হবে আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এত সহজেই আল্লাহর সেই ওহী- কে ভুলে গিয়েছেন?

হে মুসলমানের নামধারী ব্যক্তিবর্গ! একথা অবশ্যই সরণ রাখবেন যে, রাসূলের দ্বারা কোন ভুল হয় না। কারণ আল্লাহ কোরআনের স্পষ্ট বলেছেন যে: “তারকার কসম, যখন উহা অস্ত যাইতে থাকে, তোমাদের প্রতিবেশী সাক্ষী মোহাম্মদ পথভ্রষ্টও হয় নাই, ভুলেও যায়নাই, আর সে নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলে না। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা নাজম, আয়াত: ১- ৩, শূরা: ৫৩)।

এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনো ভুলেও যান না ও কারো উপর নির্ভরও করেন না (নিজের ব্যক্তিবর্গ ছাড়া) কারণ আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যে: “তিনিই (আল্লাহ) অদৃশ্য জগতের (জ্ঞানের একক) জ্ঞানী, তাঁর সে অদৃশ্য জগতের কোনো কিছুই তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেন না। একমাত্র তাঁহার মনোনীত কোন রাসূলের নিকটে ভিন্ন ইহা প্রকাশ করেন না। (সূত্র: আল কোরআন সূরা জ্বিন, আয়াত: ২৬- ২৭, শূরা নং: ৭২)।

তুমি কখনও মনে করিও না যে আল্লাহ তাঁহার রাসূলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভগ্ন করেন।  
আল্লাহ পরক্রমশালী, বিচার গ্রহণকারী। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা ইব্রাহীম, আয়াত: ৪৭,  
শূরা নং: ২১০)।

ইহা এক উপদেশ, অতএব যাহারা অভিরূচি সে তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।  
(সূত্র: আল কোরআন, সূরা মুযযামমীল, আয়াত: ১৯)।

## আশুরার রোযা প্রসঙ্গে

পবিত্র মহররম মাস হচ্ছে আরবী সনের প্রথম মাস। ইহা একটি শোকের মাস। মহররম মাসের দশ তারিখ হলো আশুরা। সারা বিশ্বের মুসলমানের জন্য ইহা একটি শোকের দিন। এই মহররম মাসে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাবলী ইতিহাসে রয়েছে। তবে সবচেয়ে মর্মান্বয়ক ঘটনা হচ্ছে কারবালার আশুরার দিন ১০ই মহররম। পবিত্র মহররমের চাঁদ উদিত হলে বিশ্বের মুসলমানদের হৃদয় পটে ভেসে উঠে কারবালার সেই ইতিহাসের ঘটনা। এটি হল বাতিলের বিরুদ্ধে হক প্রতিষ্ঠার নজিরবিহীন এক অসম যুদ্ধের ইতিহাস। যে যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) এর পরিবারের নারী, পুরুষ ও শিশুর হকপন্থি কিছু মুজাহিদ ইসলামের জন্য তাদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। পাপিষ্ঠ ইয়াজিদ বাহিনী নারীদের উপর চালিয়েছে বর্বরচিত অত্যাচার। ইয়াজিদ বাহিনী ইমাম হোসাইন (আঃ) ও তার সঙ্গী সাথীদের ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ণ্য অবস্থায় ১০ই মহররম কারবালায় নির্মমভাবে হত্যা করে। এ অত্যাচার ও নির্যাতন ইসলামের কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

ইমাম হোসাইন (আঃ) ও তার পরিবার পরিজনের এই শাহাদাত ভুলে যাবার মত নয়। মুহররমে ঘটে যাওয়া এই নিষ্ঠুর ও মর্মান্বিক ঘটনাকে স্মরণ করে মুসলমানদের একটি দল মাস ব্যাপি শোক পালন করে থাকে। তখন ইয়াজিদ অনুসারিরা ফতুয়া দিতে থাকেন শিরিক আর বেদাত না করে রোযা রাখো। কেন উনারা কি ভুলে গেছেন যে, শরিয়তে আশুরার দিন রোযা রাখা বাতিল হয়ে গেছে। দুঃখের বিষয় যে, প্রসিদ্ধ কিতাব সহী আল বোখারী, সহী মুসলিম শরীফ, মুসনাদ ইমাম ইবনে হাম্বাল, মুয়াত্তা ইমাম মালেকি ও আরো গ্রন্থ বোধ হয় দেখেন নাই। এ পুস্তকগুলোর মর্যাদা অনেক এবং উহাতেই প্রত্যেক মাযহাবের দ্বীনি আকায়েদ ও মাজহাবের ভিত্তি নিহিত।

‘রমজান শরীফের রোযা ফরজ হওয়ার পূর্বে আশুরার দিন রোযা রাখা হত। কিন্তু যখন হতে রমজানের রোযা ফরজ করা হয় তারপর হতেই আশুরার রোযা পরিত্যাগ করা হয়।’ (সূত্র:

মুয়াত্তা ইমাম মালেকি (রাঃ), প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪৭, হাদীস: ৭২৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত : ‘আশআস আশুরার দিন আব্দুল্লাহর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, তিনি খাওয়ায় রত, ইহাতে আশআস বলেন যে, আজতো আশুরার দিন আপনি কি রোযা নহেন? আব্দুল্লাহ বলেন, তুমি কি জাননা যে, আশুরার রোযা তখন পর্যন্ত জায়েজ ছিল যখন রমজান মাসের রোযা ফরয করা হয় নাই। আর যখন হতে রমজান মাসের রোযা ফরজ করা হয়েছে তখন হতে মহররমের আশুরার রোযা ছেড়ে দেওয়া হয়। (সূত্র: বুখারী, পৃষ্ঠা: ৬৪৬; সহীহ মুসলেম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫৮, লা: ১৭)

‘উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত যে, অসভ্যতার যুগে বা ইসলাম প্রচারের পূর্বে কোরইশগন ও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আশুরার দিন রোযা রাখতেন। এমনকি হিজরতের পরেও মদীনায় রোযা রাখা প্রচলন ছিল। কিন্তু রমজান মাসের রোযা ফরজ হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আশুরার রোযা পরিত্যাগ করেন।’ (সূত্র: সহী আল বুখারী, পৃষ্ঠা: ২৫৭, ২য় খণ্ড, হাদীস: ১৮৬১; মুসনাদে ইমাম হাম্বাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০)

হুমায়ূন ইবনে আবদূর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হজ্জের সালে (হজ্জের সাল - ৪৪ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া তাঁহার শাসনামলে প্রথমবার যে হজ্জ করেন উহাকে হজ্জের সাল বলা হইয়াছে) আশুরার দিবসে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান কে মিস্বরের উপরে বলিতে শুনিয়াছেন, ‘হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলেমগন কোথায়? আমি এই দিবস সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - কে বলিতে শুনিয়াছি, ইহা আশুরা দিবস; তোমাদের উপর এই (দিবসের) রোযা ফরয করা হয় নাই। আমি রোযা রাখিয়াছি, তোমরা যে ইচ্ছা কর রোযা রাখিতে পার, আর যাহার ইচ্ছা রোযা ছাড়িয়া দাও। (সূত্র: মুয়াত্তা ইমাম মালেকি (রাঃ), প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪৮ রেওয়াজত- ৭২৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫৭, হাদীস: ১৮৬২, আধুনিক প্রকাশনী, সন - ১৯৮৬)।

এবং রেওয়াতে বর্ণিত রয়েছে যে, মুয়াবিয়ার সময় সে অনেক জাল হাদীস প্রচলন করে এবং সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। ইমাম ইসহাক বিন ইব্রাহীম আনযালী (রাঃ) বলেন, ফজিলতে মাবিয়ার কোন হাদীসই সही নহে। (সূত্র: রউফল হেযাব, পৃষ্ঠা: ১১৯- ১২০)।

আল্লামা জালাল উদ্দিন সুযুতী বলেন, মাবিয়ার ফজিলতে প্রচলন হাদীসগুলো মওযু। (সূত্র: তাযেকরাতুল মওযুআত, শরহে সাপারুস সা'আদ ইত্যাদি গ্রন্থ)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ইয়াহুদীরা আশুরার দিনকে 'ঈদ' হিসেবে গণ্য করত। (সূত্র: সहीহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫৮, হাদীস: ১৮৬৪, আধুনিক প্রকাশনী, সন - ১৯৮৬)।

রোযা অবশ্যই একটি খুশির পয়গাম। রোযার বিনিময়ে আমরা আমাদের মহান রাব্বুল আলামিনের দরবার থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত হই। স্বয়ং রাসূলে খোদা (সাঃ) - ও এর জন্য আমাদের উপর রাযি থাকেন। যেমন আমরা রমজানে ৩০টি রোযা শেষ করে খুশি মনে ঈদ উদযাপন করি, সেমাই, পোলাও, কোরমা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। এই সব কিছুইতো একটি খুশির বিনিময়ে তাইনা? কিন্তু আশুরা এমন একটি দিন যে দিনে আমাদের মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রিয় নবী রাসূলে খোদা (সাঃ) - এর পুত্র (কোরআন পাকে আয়াতে মোবাহেলা দেখুন) ইমাম হোসাইন (আঃ)- কে নির্মমভাবে স্ব- পরিবার সহ মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের পাপিষ্ঠ ও নেশাখোর পুত্র ইয়াজিদ (লাঃ) ইবনে মুয়াবিয়া হত্যা করেছিল। জবাইকৃত পশুরমত কুরবানী করেছিল ইমাম হোসাইন (আঃ)- কে কারবালা প্রান্তরে। কিন্তু তখন ইয়াজিদের পক্ষবাদী কোন মুসলমান সেই মাজলুম ব্যক্তিটির পক্ষে সাক্ষ দেয় নাই। ইমাম হোসাইন রাসূলের কষ্টের গড়া দ্বীনে ইসলাম ও তার শরিয়তকে চিৎকার দিয়ে দিয়ে সেই নামধারী মুসলমানদের সামনে প্রকাশ্য ঘোষণা দিচ্ছিলেন। কিন্তু হায়! সেই দিন কেউ মানেনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর সেই শরিয়ত। আর ইমাম হোসাইন (আঃ) বিনা দোষে শহীদ হয়ে যান। পূর্বে বছ রেওয়াতের তারিখ ছিলো এই দিনটি। কিন্তু কারবালার ঘটনার পর থেকে আশুরার এই দিনটি ইসলামের ইতিহাসের পাতায় একটি শোকের দিন হিসাবে পালন করা হয়। যত নবী রাসূলগনের ইতিহাসে তাঁদের

জন্ম, নাযাত, খুশি, আমেজ- ফূর্তি ছিল সব থমকে যায় শুধু রয়ে যায় রাসূলের পরিবারের সেই শোক। তাই আমাদেরকে আশুরার দিন সকল প্রকার খুশি বর্জন করে শোক পালন করতে হবে ও তাদের উসিলায় নিজেদের জন্য দোয়া খায়ের চাইতে হবে। দোয়া তাঁদের (ইমাম হোসাইনের) জন্য নহে। আমরা তাঁদের শাফায়াত আশা করি, তাঁরা আমাদের নহে।

## তারাবীহ নামায প্রসঙ্গে

তারাবীর নামায রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর সুন্নাত কিনা- তা নিয়ে মতভেদ আছে। আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ আবু যর গিফারি (রাঃ) এর সূত্রে রমযানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নফল নামায সম্পর্কে হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাতে আবু যর (রাঃ) বলেন, আমরা রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে রোযা রেখেছি। কিন্তু আমাদের সাথে নিয়ে তিনি এমাসে নফল নামায পড়ার রীতি চালু করেননি। তবে মাসের সাতদিন বাকি থাকতে তিনি এসে আমাদের সাথে নফল নামায পড়তে শুরু করলেন। তাও চারদিন পড়িয়ে তিনি আর এ নামায পড়াননি।

বুখারি ও মুসলিমে য়ায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে মাদুরের হুজরায় থাকতে শুরু করলেন (অর্থাৎ রমযানের শেষ দশদিন ই' তেকাফের উদ্দেশ্যে)। সেখানে তিনি কয়েক রাত্রি (নফল) নামায পড়লেন। এমনকি লোকেরাও তার সাথে নামায পড়তে শুরু করলো। অতপর একদিন লোকেরা তাঁর কোনো সাড়া শব্দ পেলনা। তারা ভাবলো, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাই কেউ কেউ গলা খাকরাতে শুরু করলো, যাতে করে তিনি তাদের কাছে বেরিয়ে আসেন। তাদের অবস্থা লক্ষ্য করে তিনি বলে উঠলেন: “এই নামাযের ব্যাপারে আমি তোমাদের তৎপরতা লক্ষ্য করেছি। আমার আশংকা হয়, এই নামায তোমাদের উপর ফরয হয়ে না পারে। যদি ফরয হয়ে যায়, তবে তোমরা তা পালন করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা এ নামায ঘরে পড়ো। কারণ, ফরয নামায ছাড়া অন্য নামায ঘরে পড়াই উত্তম।” (সূত্র: মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র), প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৬, হাদীস: ৩১৪; সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬০, হাদীস: ১৮৬৯, আধুনিক প্রকাশনী, আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন, পৃষ্ঠা: ১৭৬, আল্লামা হাফিয ইবনুল কাযিয়ম, আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত)।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযানের রাতে নামায পড়ার জন্যে আমাদের উৎসাহ দিতেন। তবে এ ব্যাপারে আমাদের খুব তাকিদ করতেন না।



তিনি বলতেন: ‘যে ব্যক্তি ঈমান ও আশা নিয়ে রমযান মাসে নামাযে দাড়াবে তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।’ অতপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওফাত লাভ করেন এবং এ ব্যাপারে অবস্থা একই রকম থাকে। আবু বকর এর খেলাফতকালে একই অবস্থা থাকে (অর্থাৎ: তারাবীর জামায়াত কায়েম হতোনা। কেউ পড়লে ব্যক্তিগতভাবে পড়তো) উমর এর খিলাফতের প্রথম দিকেও একই অবস্থা থাকে। (সূত্র: মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র), প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৬, হাদীস: ৩১৪; আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন, পৃষ্ঠা: ১৭৬, আল্লামা হাফিয ইবনুল কাযিম, আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত)।

সহীহ বুখারীতে আবদুর রহমান বিন আবদুল কারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক রাতে আমি (খলিফা) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে বেরিয়ে মসজিদের দিকে এলাম। আমরা এসে দেখি, লোকেরা মসজিদে ভাগে ভাগে নামায পড়ছে। কেউ নিজের নামায নিজে পড়ছে, আবার কারো কারো সাথে কয়েকজন একত্র হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা দেখে উমর (রাঃ) বললেন: আমি যদি এই সবাইকে একজন ইমামের পিছে একত্র করে দিই, তবে তো উত্তম হয়। অতপর এ বিষয়ে তিনি মনস্তির করেন এবং সবাইকে উবাই ইবনে কা’আবের পিছনে একত্র করে দেন। আবদুর রহমান বলেন: এরপর আরেক রাতে আমি হযরত উমরের সাথে বেরলাম। আমরা দেখলাম, লোকেরা তাদের কারীর পেছনে নামায পড়ছে। এ অবস্থা দেখে হযরত উমর বলে উঠলেন এটা একটা উত্তম বিদআত (নতুন নিয়ম)। তিনি লোকদের বললেন: রাতের সেইভাগ অর্থাৎ তাঁর মতে শেষ ভাগ যাতে মানুষ ঘুমায় তার চাইতে উত্তম রাতে মানুষ দাঁড়ায়। আর মানুষ রাতের প্রথম ভাগেই দাড়িয়ে থাকে। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫৯, হাদীস: ১৮৬৮, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৬)।

মু’আত্তায়ে মালিক- এ সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: খলিফা উমর উবাই ইবনে কা’আবের এবং তামীমদারীকে রমযান মাসে লোকদেরকে এগারো রাকাত (বিতরসহ) নামায পড়াতে নির্দেশ প্রদান করেন। অতএব ইমাম শত আয়াতের কিরাত দিয়ে আমাদের নামায পড়াতেন। এতো লম্বা কিয়ামের কারণে আমরা শেষ পর্যন্ত লাঠিতে ভর দিয়ে

দাঁড়াতে বাধ্য হই। ফজরের কাছাকাছি সময় আমরা এ নামায থেকে ফারেগ পেতাম। (সূত্র: মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র), প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৭, হাদীস: ৩১৮)।

সহীহ আল বুখারীর ও মুয়াত্তার হাদীস অনুযায়ী রাসূল (সাঃ) - এর সময়ে ইহার কোন প্রচলন ছিলো না। হযরত ওমর তারাবীহ- কে অনুষ্ঠান ও অনুশীলনের মাধ্যমে প্রচলন করে গেছেন। এবং হযরত ওমর নিজেও কখনো তারাবীহ নামাযকে আদায় করেছেন কিনা তার কোন প্রমাণ নেই। কারণ দ্বিতীয় রাতে যখন তিনি বের হন তখন তিনি দেখলেন সকলে নামাযরত অবস্থায়, আর তিনি পেছন থেকে আব্দুর রহমানের সাথে এই নামায সম্বন্ধে কথা বলছিলেন।

(তারাবির নামায) মহানবী (সাঃ) - এর অনুসরণে আদায় করা মুস্তাহাবে মুয়াক্কাদাহ বলে পরিগণিত। শিয়াদের ফিকাহ মোতাবেক রমযান মাসের রাতগুলোতে মোট এক হাজার রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব, কিন্তু এ নামাযগুলো জামায়াতে আদায় করা বেদআত। অবশ্যই এ নামাযগুলো একাকী (ফেরাদা) মসজিদে এবং অধিকাংশ সময়ে গৃহে আদায় করতে হবে। যাদের ইবনে সাবেত মহানবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, কোনো ব্যক্তির জন্যে গৃহে নামায পড়া মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। যদি না তা ওয়াজিব নামায হয় কেননা ওয়াজিব নামাযগুলো মসজিদে আদায় করা মুস্তাহাব। (সূত্র: তুসী, খেলাফ কিতাবুস সালাত, মাসয়ালা- ২৬৮)।

ইমাম বাকের (আঃ) বলেন, মুস্তাহাব নামাযগুলোকে জামায়াতে পড়া যাবে না এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে যে কোনো প্রকার বিদআতই পথভ্রষ্টতা যার পরিণতি হলো আগুন। (সূত্র: সাদুক খেসাল ২/১৫২)।

ইমাম রেজা (আঃ) ও স্বীয় রেসালা যা একজন মুসলমানের আকাইদ ও আমল' শিরোনামে লেখা হয়েছে, তাতে উল্লেখ করেছেন যে, মুস্তাহাব নামাযগুলোকে জামায়াতে পড়া যায় না এবং এমনটি করা হল বিদআত। (সূত্র: সাদুক, উয়ুনে আখবারে রেজা (আঃ), খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১২৪)।

জামায়াতবদ্ধ হয়ে তারাবীর নামায আদায় করার ব্যাপারটি (যা আহলে সুন্নতের ও অন্যান্য মাজহাবের মধ্যে প্রচলিত) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত মতের (ইজতেহাদ বে রায়) মাধ্যমে বৈধতা দান করা হয়েছে। আর তাই একে বিদআতে হাসানা (বা সুন্দর বেদআত)

বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (সূত্র: কাসতালীনী এরশাদুস সারী ৩/২২৬, আইন উমদাতুল কারী ১১০/১২৬ শাতেবী, আল এ'তেসাম ২/২৯১; গ্রন্থস্বত্ব: ইমামিয়া বিশ্বাসের সনদ-পৃষ্ঠা: ২৩২)।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি দুটি উটের পিঠে পানি বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাতের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এসেছিল। এই সময় সে মু'আযকে নামাযে রত দেখতে পেয়ে উট দুটি বসিয়ে মু'আযের সাথে নামাযে शामिल হল। তিনি নামাযে সূরা বাকারাহ অথবা নিসা পাঠ করতে থাকলে লোকটি (বিরক্ত হয়ে নামায ছেড়ে) চলে গেল। পরে সে জানতে পারল, তার এ কাজে মু'আয মনক্ষুন্ন বা দুঃখিত হয়েছে। সুতরাং সে নবী (সাঃ) - এর নিকট গিয়ে মু'আযের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে নবী (সাঃ) তাকে তিনবার বললেন, হে মু'আয! তুমি কি ফেতনা সৃষ্টিকারী (হিসেবে গণ্য হতে চাও)? তুমি সাক্বিহিস্মা রাব্বি আল-আলা, ওয়াশশামসি ও দুহাহা কিংবা ওয়াল্ - লাইলে ইয়া ইয়াগশা মত সূরা পাঠ করে নামায আদায় করলে কতই না উত্তম হত। কেননা তোমার পিছনে বৃদ্ধ, দূর্বল ও (জরুরী) প্রয়োজনে ব্যস্ত (সব রকমের) লোকই নামায আদায় করে থাকে। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৯- অনুচ্ছেদ, হাদীস: ৬৬২- ৬৬৩, আধুনিক প্রকাশনী)।

আল্লাহ তায়ালা বলছেন: 'এখন থেকে (নামাযে কোরআন) ততটুকুই পড়, যতটুকু তোমরা সহজে পড়তে পার। আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের কতক লোক অসুস্থ থাকে অন্য কতক লোক আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করার জন্য সফর করে থাকে, আরো কতক লোক আল্লাহর পথে লড়াই করে। তাই কোরআনের যতটুকু সহজে পড়া যায় ততটুকুই পড়ে নাও। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা মুয্যাম্মিল, আয়াত: ২০, শূরা নং: ৭৩, অধ্যাপক গোলাম আযম অনুবাদিত)।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ যখন ইমামতী করবে, তখন যেন সে স্বল্প কেয়াত করে। কেননা জামাআতে দূর্বল, বৃদ্ধ ও প্রয়োজনে ব্যস্ত লোকও থাকে। কিন্তু তোমরা কেউ একাকী নামায আদায় করলে যতটা ইচ্ছা

কেরাআত দীর্ঘ করতে পার। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৯, হাদীস: ৬৫৯-৬৬৪)।

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ) নামায সংক্ষিপ্ত করতেন, তবে পূর্ণাঙ্গ করে আদায় করতেন। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১০- অনুচ্ছেদ, হাদীস: ৬৬৪, আধুনিক প্রকাশনী, সন- ১৯৮৬)।

সহীহ আল বুখারীর মতে ইবাদতে কঠোরতা অবলম্বন মাকরুহ। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪৪, অনুচ্ছেদ, আধুনিক প্রকাশনী)।\*

আল্লাহ বলেছেনঃ “বস্তুতঃ তাঁরা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন অত্যন্ত আলস্যের সঙ্গে দাঁড়ায়, মানুষকে দেখাবার জন্য অন্তর তাদের আল্লাহকে স্মরণ করে না। (সূত্র: আল কোরআন, সূরা নিসা: আয়াত: ১৪২, সূরা নং: ৪)।

প্রত্যেক বিদ-আতই ভ্রষ্টতা। (সূত্র: সীরাতে খাতিমুল আশ্বিয়া, পৃষ্ঠা: ১১৬, এমদাদিয়া লাইব্রেরী)।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ) বলেছেন, আমি হাউযে কাউসারে তোমাদের অগ্রগ্রামী প্রতিনিধি হবো, তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে, আর যখন আমি তাদেরকে পান করাতে উদ্যত হবো, তখন আমার থেকে তাদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, আমি বলবো হে পরোয়ারদিগার! এরা তো আমার সাহাবী (উম্মত,) তিনি বলবেন, আপনি জানেন না তারা আপনার পর - নতুন (বিদআত) কি করেছে। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, (আধুনিক) ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস: ৬৫৬০, পৃষ্ঠা: ৩১৩)।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেনঃ ফিতনা- ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা ব্যাপক হওয়ার পূর্বেই নেক কাজ করার জন্য এগিয়ে আসার প্রতি উৎসাহ প্রদান করো। কারণ মানুষ তার দুনিয়ার সামান্যতম স্বার্থের বিনিময়ে নিজের দীনকে বিক্রিয়ে দিবে। (সূত্র: সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৭, হাদীস: ২২১, (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার)।

আমর ইবনে যুরার (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন সালাতকেও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। (সূত্র: বুখারী শরীফ, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮, হাদীস: ৫০৪ - ৫০৫)।

রাসূলের সহচর, সাহাবী (উম্মত) ও সাখীগনরা রাসূলের পর নতুন (বিদআত) উদ্ভাবন করেছে। (সূত্র: মুসলীম শরীফ, (ই.ফা.বা) ষষ্ঠ খণ্ড, হাদীস: ৫৭৭৬, পৃষ্ঠা: ৩১১; মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭, হাদীস: ১৩৭৭, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

## রমজানের মাসলা- মাসায়েল ও আমাল- ইবাদত

ফুরুয়ে দ্বীনের নামাযের পর দ্বিতীয় স্তম্ভ হল রোযা। পূর্বে নামায সম্পর্কিত একটি বই আপনাদের নিকট উপস্থাপন করেছি। মাহে রমযানের রোযা দ্বীনের ফরজ আহকাম। ইহা স্বাবালক মুসলমানের উপর ফরজ। রোযা সম্বন্ধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলো আমাদের সকলের জানা উচিত। বিশেষ করে মাজহাবী ভাই- বোনদের জন্য বিভিন্ন পুস্তক হতে সংগৃহীত রোযার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলো সংক্ষেপে উপস্থাপন করছি। আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন।

### রোযার নিয়তঃ

বাংলা উচ্চারণ: “মাহে রমজানের আগামীদিনের রোযা রাখার নিয়ত করছি কোরবাতান এল্লাহ্‌হা।” রোযার নিয়ত রমজানের প্রথম রাত্রিতেও সমস্ত মাসের জন্য নিয়ত করা যেতে পারে অথবা পৃথক ভাবে প্রতিদিনের নিয়ত করা যায়।

### ইফতারের দোয়াঃ

“আল্লাহুমা লাকা সুমতু ওয়া আলা রিয়কেকা আফতারতু ওয়া আলায়কা তাওয়াক্কালতু।” হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রোযা রেখেছিলাম এবং তোমারই দেয়া রুজীর উপর নির্ভর করেছিলাম। এখন তোমার অনুগ্রহে ইফতার করছি। হে শ্রেষ্ঠ মেহেরবান।

## যেসকল কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ঃ

- (১) রোযার মধ্যে পানাহার করলে।
- (২) কন্ঠনালীতে ধুলো- বালি বা ভারীধোঁয়া পৌঁছালে।
- (৩) ইচ্ছাকৃত ভাবে বমি করলে।
- (৪) খোদা, রাসূল ও আয়েম্মায়ে আহলে বায়েতের সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপ করলে।
- (৫) পানিতে ডুব দিয়ে গোসল করলে বা মাথা পানিতে ডুবালে।
- (৬) গুহ্যদেশে জলীয় ঔষধ প্রবেশ করলে।
- (৭) যৌন মিলনে।
- (৮) হস্ত মৈথুন করলে।
- (৯) রোযা শুরু হওয়ার সময় পর্যন্ত বীর্যনির্গত, ঋতুস্রাব এবং প্রসবজনিত অপবিত্র থাকলে।

## রোযা ভঙ্গের কাফফারাঃ

বিনা কারণে রোযা না রাখলে বা রোযা রেখে ভাঙ্গলে প্রত্যেক রোযার জন্য ৬০ রোযা রাখতে হবে অথবা ৬০ জন মিসকিনকে খাওয়াতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে একজন গোলামকে আজাদ করতে হবে।

## রোযা মাকরুহ হওয়ার কারণঃ

- (১) বৃক্ষের কাচা ডাল দ্বারা দাঁতন করলে।
- (২) সুগন্ধি তেল ও আতর ব্যবহার করলে।
- (৩) সুগন্ধি ফুলের ঘ্রাণ লইলে।
- (৪) গরমের সময় রোযা রেখে ঠান্ডা হওয়ার জন্য ভিজা কাপড় শরীরে বেশীক্ষণ রাখলে।
- (৫) দাত ফেললে।

- (৬) উত্তেজিত হয়ে স্ত্রীকে চুম্বন করলে।
- (৭) চোখ, নাক ও কানে ঔষধ দিলে।
- (৮) দিনের বেলা সুরমা লাগালে।
- (৯) শরীরে ইনজেকশন দিলে ইত্যাদি। উপরোক্ত কাজ গুলো করলে রোযা কখনো ভঙ্গ হয়না তবে বিরত থাকা উচিত।

#### যারা রোযা রাখতে পারবে নাঃ

- (১) পীড়িত ব্যক্তি, যার জন্য রোযা রাখা ক্ষতিকর।
- (২) ভ্রমণকারী (যাতায়াতের পথ ৪৮ কিলোমিটার হলে)।
- (৩) যে নারী ঋতুস্রাব বা প্রসবজনিত রক্ত দেখতে পায়।
- (৪) যে গর্ভবতী নারীর প্রসবের সময় ঘনিয়ে এসেছে এবং রোযা তার জন্য বা শিশুর জন্য ক্ষতিকর।
- (৫) দুধদানকারী মায়ের রোযা রাখা যদি তার শিশুর জন্যে ক্ষতির কারণ হয়।
- (৬) যে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধার জন্য রোযা রাখা দুঃসাধ্য। (উপরোক্ত ৪, ৫, ৬ নং শর্তের আওতাভুক্তরা কারণ দূর হবার পর রোযা কাযা করতে হবে এবং প্রতিদিনের রোযা ভাঙ্গার জন্য প্রায় ৭৫০ গ্রাম করে গম/চাল ফকীরকে দান করতে হবে।

#### মোস্তাহাব রোযাঃ

- (১) প্রত্যেক চন্দ্র মাসের প্রথম তারিখে।
- (২) প্রত্যেক চন্দ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার।
- (২) প্রথম ১০ দিনের মধ্যের প্রথম বুধবার। প্রত্যেক মাসে ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ।
- (৫) রজব এবং শাবানের পুরো মাস।
- (৬) ঈদে নওরোজ- এর দিন।



- (৭) জেলক্কদের ২৫ এবং ২৯ তারিখ।
- (৮) জিলহজ্জের ১ হতে ৯ তারিখ পর্যন্ত।
- (১০) মুহররমের ১ হতে ৩ তারিখ পর্যন্ত।
- (১১) ঈদে মিলাদুন্নবী ১৭ই রবিউল আউয়ালের দিন।
- (১২) ঈদে বেয়সত্ ২৭ রজব শবে মেরাজ।
- (১৩) ১৫ই শাবান শবে বরাতের দিন।

## সূচীপত্র :

রমজান প্রসঙ্গে আলোচনা . . . . .	3
রোযা প্রসঙ্গে . . . . .	7
আসীল (সন্কা) ও লাইল (রাত) প্রসঙ্গে . . . . .	12
ইফতারের সময়সীমা প্রসঙ্গে . . . . .	16
সেহরীর সময়সীমা প্রসঙ্গে . . . . .	26
সাদকাতুল ফিতরা প্রসঙ্গে . . . . .	29
যাকাত প্রসঙ্গে . . . . .	35
সুদ প্রসঙ্গে . . . . .	42
খুমস প্রসঙ্গে . . . . .	44
লাইলাতুল কদর (শবে কদর) প্রসঙ্গে . . . . .	53
আশুরার রোযা প্রসঙ্গে . . . . .	60
তারাবীহ নামায প্রসঙ্গে . . . . .	64
রমজানের মাসলা-মাসায়েল ও আমাল-ইবাদত . . . . .	70
যেসকল কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ঃ . . . . .	71